বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

ও

ভাষা-প্রীতি

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫২

মূল্য—৩৷৷০

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT (OFFG.), AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1756B—July, 1952—E.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-দীপ্ত ইতিহাসে

যাঁহার আসন সকলের উচ্চে,

সারস্বত-যজ্ঞের সেই শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্

স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নামে

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া

ধন্য বোধ করিলাম।

সূচীপত্র

নিবেদন

গ্রন্থের ভূমি-ভিত্তির পরিচয়-প্রদানকে যদি ভূমিকা-লিখনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে বলিতে পারি যে, সে পরিচয়ের অনেক কথাই এই পুস্তকের 'উপক্রমণিকা'য় দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং পুনরুক্তি-দোষ যাহাতে না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবশিষ্ট যাহা বক্তব্য, তাহাই এখানে বলিতেছি।

প্রথমে 'জাতিবৈর'-সম্বন্ধে কিছু বলা সমীচীন বোধ করি। কারণ, এই শব্দের প্রয়োগ এই গ্রন্থের অনেক স্থানেই আছে, অথচ ইহার তাৎপর্য্য-প্রসঙ্গে কোথাও কোনও কথা বলা হয় নাই।

মনে পড়ে, ১৩০৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'অত্যুক্তি' নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার একস্থানে আছে,—"আজকালকার সাম্রাজ্য-মদমত্ততার দিনে ইংরেজ নানা প্রকারে শুনিতে চায়—আমরা রাজ-ভক্ত—আমরা তাহার চরণ-তলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত।"—কথাটা অবশ্য অসত্য না হইলেও এই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজের এই মনোবৃত্তির মূলে আমরাই সযত্নে জল সেচন করিয়াছিলাম। আমরা যে পরম 'রাজ-ভক্ত' বা 'ইংরেজ-ভক্ত'—এ কথা ইংরেজ শুনিতে চাহিবার আগে আমরাই ইংরেজকে তাহা নানা ভাবে প্রাণ ভরিয়া শুনাইতে আরম্ভ করি। তাহার সাক্ষী—সেকালের পণ্ডিত-রচিত এই শ্লোক—

> "ডফ্ ডেভিড্ কল্ভিনশ্চৈব কেরী মার্শমেনস্তথা।
> পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনম্॥"

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, নববর্ষ-উপলক্ষে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার 'সম্বাদ-ভাস্কর' পত্রে 'ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে' যে ভাবে 'নমস্কার' জানাইয়াছিলেন, তাহারও এক টুক্‌রা নমুনা এখানে দিতেছি—"হে বারোশত ছাপ্পান্ন বৎসর, তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি। * * প্রস্তাব সমাপ্তিকালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে নমস্কার করি, আমাদিগের প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ না হইলে আমরা এত উন্নত হইতে পারিতাম না।" ইত্যাদি।

এই প্রকার রাজ-ভক্তি বা ইংরেজ-ভক্তির আতিশয্যে ও অত্যুক্তিতে বোধ করি বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়াই ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছিলেন—

"কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

এই দুই ছত্রের মধ্যে জাতিবৈরের বীজ নিহিত আছে বলিলে অন্যায় হয় না। এই জাতিবৈর শব্দ বাঙ্গালারচনায় প্রথম আমদানি কে করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানি না। তবে বাঙ্গালীকে তাহার মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রই যে সর্ব্বপ্রথম 'জাতিবৈর' নামে একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সংশয় করিবার কিছু নাই। এই প্রবন্ধে তিনি কি বুঝাইয়াছিলেন, তাহা জানিবার আগে—কবে এবং কেন তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ, তাহা হইলে আমার বক্তব্য আরও বিশদ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

"ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ'—এ কথা ঠিক হ'তে পারে, তবে ঐ আমরার ভেতর দেশশুদ্ধকে জড়াও কেন?"—ইহা স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি। স্বামীজির সময়ে 'সাহেবদের কাছে ঐ নাকি-কান্না'র জের অবশ্য থাকিলেও তাহার জোর কিন্তু ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের ঐ দাস-সুলভ মনোভাবের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া বঙ্কিম-আমলেই প্রকটিত হয়। স্বামীজির বয়স তখন নয় কি দশ বৎসর হইবে, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' (১২৭৯ সাল) বলিয়াছিলেন—"ইংরাজের তুলনায় আমাদিগের কিছুই প্রশংসনীয় নহে, আমাদের কিছুই ভাল নহে, এ কথা সত্য কিনা, তাহা আমরা ঠিক জানি না; কিন্তু প্রত্যহ শুনিতে শুনিতে আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটি ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। যাহাতে কিছু ভাল নাই, তাহা কে ভালবাসিবে? * * এই জন্য আমাদের সর্ব্বদা ইচ্ছা করে যে, সভ্যতম জাতির অপেক্ষা আমরা কোন অংশে ভাল কিনা, তাহা শুনি। কিন্তু কোথাও তাহা শুনিতে পাই না।"

বঙ্কিমচন্দ্র যাহা শুনিতে চাহিয়া কাহারও কাছে শুনিতে পান নাই, বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালীকে তাহা শুনাইবার জন্য কিছু কাল পরে তিনি নিজেই 'জাতিবৈর' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

১২৮০ সালের 'সাধারণী' পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। যে বিশ্বাসের ফলে স্বদেশবাসী 'স্বদেশভক্তি ও স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা' হারাইয়া ফেলে, সেই বিশ্বাস-বিষবৃক্ষকে বিনাশ করিবার উপায় কি, সেই কথাই উক্ত নিবন্ধে বিশদ ভাবে বলা হয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ভারতবর্ষীয় যে কোন ইংরেজি সম্বাদ পত্র (ইংরেজি সম্বাদ পত্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা সম্পাদিত সম্বাদ পত্র) আমরা হস্তে গ্রহণ করি না কেন, সন্ধান করিলে অবশ্যই দেখিব যে তাহার কোন স্থানে না কোন স্থানে দেশীয় লোকদিগের উপর কিছু গালি—কিছু অন্যায় নিন্দা আছে। আমরা যে কোন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পড়ি না কেন, সন্ধান করিলে তাহার কোন অংশে না কোন অংশে—ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ, ইংরেজের নিন্দা—অবশ্য দেখিতে পাইব। * * সম্বাদপত্রে যেরূপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেইরূপ। ইহা জাতি-বৈরের ফল। এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতি-বৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতিবৈরের জন্য দুঃখিত। * * ইহার শমতা জন্য কত ইউনিয়ন-ক্লব সংস্থাপিত হইয়া, সূপকার এবং মদ্য-বিক্রেতাকুলের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে; কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষ নামিল না। দুঃখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে এই জাতিবৈর শমিত করিয়া আমরা উপকৃত হইব কিনা? আর উপকৃত হই বা না হই, বাস্তবিক ইহার শমতা সাধ্য কি না?"

"ইংরেজেরা যে এদেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ, তাহা আত্মগৌরবান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অস্বীকার করিবেন না। * * যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ, হিতা-কাঙ্ক্ষী এবং শমিত-বল হইয়া থাকিতে পারেন, নিকৃষ্ট পক্ষ তাঁহাদিগের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ের প্রীতির সম্ভাবনা। যে নিকৃষ্ট হইয়া, বিনীত বশ্য এবং ভক্তিমান্ না হইবে, শ্রেষ্ঠ তাহার উপর কাজে-কাজেই বিরক্ত হইবেন। আর যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বল প্রকাশ এবং অনিষ্টকারী হইবে, নিকৃষ্ট সুতরাং তাহার উপর রাগ করিবেন। অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদিগের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিত-বল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইতে পারি, তবে জাতিবৈর দূর হইতে পারে। কিন্তু

ইংরেজেরা জেতা, আমরা বিজিত। মনুষ্যের স্বভাবই এমত নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান্ হয়, অথবা তাঁহাদিগকে হিতাভিলাষী নিস্পৃহ মনে করে; এবং জেতাও কখন বল-প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। **আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেন না আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাপি মহাভারত-রামায়ণ পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর-আরাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল—যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই।** এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর-ভাবের কারণেই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত উপহসিত হইলে, যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু, বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না। কেন না, সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।”

“যদি শুভানুধ্যায়ীদিগের যত্ন সফল হইয়া, সম্প্রতি জাতিবৈরিতার উপশম ঘটে, তাহা হইলে আমরা যে মানসিক সম্বন্ধের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা অবশ্য ঘটিবে। জাতিবৈর উচ্ছিন্ন হইলেই নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান্ হইবে,—কেন না, সে অবস্থা না ঘটিলে জাতিবৈর যাইবে না। এইরূপ মানসিক অবস্থা, উন্নতির পথরোধক। * * সে দুরবস্থা কখন না ঘটুক। জাতিবৈর এখনও বহুকাল বঙ্গদেশে বিরাজ করুক।”

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র জাতিবৈর-সম্বন্ধে যেমন বুঝাইয়াছিলেন, আমি সেই অর্থেই ঐ শব্দ এই গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছি।

এইবার এই পুস্তক-সম্পর্কে কিছু বলিয়া এই ‘নিবেদন’ শেষ করিব। ১৩২৭ সালে মৎ-সম্পাদিত ‘সারথি’ পত্রে ‘বঙ্গ-সাহিত্যে

দেশাত্মবোধ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধকে এই পুস্তকের বীজ বলিতে পারা যায়। উহা পাঠে প্রীত হইয়া পূজনীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ঐ বিষয়াবলম্বনে একখানি গ্রন্থ লিখিতে বলেন। তাঁহার কথা-মত তাহা লিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দুঃখ এই যে, তাঁহাকে তাহা দেখাইতে পারি নাই। কারণ, সে পুস্তক-প্রকাশ-কালে তিনি জীবিত ছিলেন না। ১৩৩৬ সালে 'স্বদেশ-মঙ্গল' নামে উহা প্রচারিত হইয়াছিল।

সুধী-সমাজে 'স্বদেশ-মঙ্গল' যে সমাদর লাভ করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। 'পুস্তক-পরিচয়'-প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' বলিয়াছিলেন, —"বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতির যে ধারা বহিয়া আসিতেছে, বইখানি তাহারই ইতিহাস।"—এইরূপ অভিমত সে-সময়ে 'হিতবাদী,' 'বঙ্গবাসী,' 'অমৃতবাজার পত্রিকা,' 'লিবার্টি' প্রভৃতি পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই সকল অভিমতে আমার মন সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে নাই। কারণ, আমি জানিতাম, যে সকল কথা না থাকিলে পুস্তকের অঙ্গহানি হয়, তেমন অনেক কথাই ঐ গ্রন্থে পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ-সরকারের কঠোর শাসন-ফলে অনেক সত্য কথাই তখন বলিবার বা লিখিবার উপায় ছিল না। 'সিডিসনে'র অছিলায় কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে সে সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। পাছে 'স্বদেশ-মঙ্গলে'রও সেই দশা ঘটে, সেই আশঙ্কায় অনেক কথাই উহাতে লিখিতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে দেশের সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে। তাই পূর্ব্বে যাহা বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, এবার তাহা ইহাতে যোগ করিয়াছি। গ্রন্থের অনেক স্থল নূতন করিয়া লিখিয়াছি। তাহা ছাড়া, 'ভাষা-প্রীতি' নামে একটি নূতন অধ্যায় ইহাতে সংযোজন করিয়াছি। সুতরাং 'স্বদেশ-মঙ্গল' অবলম্বনে লিখিত হইলেও ইহাকে একরূপ নূতন পুস্তক বলিতে পারা যায়। সেই জন্য ইহার নামেরও পরিবর্ত্তন করিয়াছি। পূর্ব্ব গ্রন্থের তুলনায় ইহার আকার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এই পুস্তকে 'ভাষা-প্রীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ-সন্নিবেশের সার্থকতা বা উপযোগিতা কি? ইহার উত্তরে আমি অক্ষয়চন্দ্রের ভাষায় আমার মনের কথা বলিতেছিঃ— "ভাষাই জাতিত্বের প্রধান চিহ্নস্বরূপ, ভাষার উৎকৃষ্টতাই সকল জাতির সম্মান-ভূমি—দেশীয় ভাষার অনুরাগই দেশ-হিতৈষিতার ও তাহার প্রতি বিপক্ষতাচরণই দেশ-বৈরিতার প্রধান লক্ষণ। মাতৃভাষানুরাগ স্বদেশ-

হিতৈষিতার একটি প্রধান অঙ্গ। যাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ নাই, তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিতাও নাই।"

'নিবেদন'-শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার (অস্থায়ী) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর-বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র—আমার এই দুই পরম শ্রদ্ধেয়, পরম সাহিত্য-রসিক সুহৃদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বোধ করি। ইঁহারা উভয়ে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমাকে যে উৎসাহ ও সুপরামর্শ প্রদান করেন, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না।

১৭ই চৈত্র, ১৩৫৮ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম
ও
ভাষা-প্রীতি

উপক্রমণিকা

বহুকাল হইতেই বাঙ্গালীজাতি 'বন্দে মাতা সুরধুনী'র গান গাহিয়া আসিতেছে, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া দেশ-মাতার বন্দনা করিতে পূর্ব্বে সে জানিত না। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে জাতি শুধু গণেশ হইতে গৌরাঙ্গদেব নয়,—এমন কি, মনসা ও তুলসী বৃক্ষকেও দেবতার আসনে বসাইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে বরাবর ভাষার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছে, সেই জাতিরই প্রাচীন সাহিত্যে দেশ-মাতা ও ভাষা-জননীর স্তব-স্তুতিপূর্ণ তেমন কোন গান বা কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ, সংস্কৃতসাহিত্যে উহার অস্তিত্বের যে আদৌ অভাব, এমন কথাও বলিতে পারি না। লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের এই উক্তি—"নেয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা রোচতে মম লক্ষ্মণ, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"—শুনিতে পাই রামায়ণের সংস্করণ-বিশেষে আছে। এত স্বল্প কথায় এমন প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি আর কোথাও আছে কিনা, জানি না।

মহাভারতের একস্থলে আছে, যুধিষ্ঠিরকে বেদব্যাস বলিতেছেন—"যাহারা জাতিশ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা। তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম-ক্ষয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্তই নাই।" তারপর 'বিষ্ণুপুরাণে' ভারত-মাতার যে মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দেখা যায়, তাহাও মনোহর। 'বিষ্ণুপুরাণে' আছে,—"সমুদ্রকে দক্ষিণে রাখিয়া হিমগিরিকে মস্তকে ধরিয়া যে বর্ষ অবস্থান করিতেছে—যে বর্ষের নাম ভারতবর্ষ—ভরত-সন্ততিরা যথায় বাস করিয়া থাকেন, মুনে, এই সেই লোক, যে স্থান হইতে লোকে স্বর্গ, মোক্ষ, মধ্য, অন্ত অর্থাৎ অন্তরীক্ষ এবং পাতাললোক প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন স্থানেই মর্ত্ত্য-মানব কর্ম্মভূমির মাহাত্ম্য জানে না। এই ভারতবর্ষের জন্যই সত্য,

ত্রেতা, দ্বাপর, কলি-আদি চারি যুগ কল্পিত হইয়াছে। অপর বর্ষে যুগ-ভেদের প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে এই স্থানে বসিয়াই তপস্বী জনেরা তপস্যা করিতে পারেন—এই স্থানে বসিয়াই যাজ্ঞিকেরা আহুতি দিয়া থাকেন, পরলোকের আদরার্থ যে কিছু দান-কার্য্য, তাহাও এই স্থানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে যজ্ঞপুরুষ জানিয়া তৎ-প্রীত্যর্থে এই জম্বুদ্বীপের লোকেরাই যজ্ঞ-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে—অন্য দ্বীপের এরূপ ব্যবস্থা নয়। মহামুনে, জম্বুদ্বীপ-মধ্যে আবার ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবাসীরাই ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া ব্যবহার করে, অপর সমুদয় ভূমি ভোগ-তৃপ্তির জন্য অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণিগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্য-বলে এই পুণ্যভূমি ভারতে মানব-জন্ম লাভ করিয়া থাকে। দেবতারাও গান করিয়া থাকেন, ভারতবাসীরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য; কারণ, তাঁহাদের জন্মভূমি স্বর্গ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তিরই হেতু। ভারতের নির্ম্মল নিষ্পাপ লোকেরাই তাঁহাদের সমুদয় কর্ম্ম-ফল পরমাত্মাস্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন। স্বর্গপ্রদ পুণ্য-কর্ম্ম ক্ষয় হইলে আবার কি প্রকারে সমুদয় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিব, দেবতারা এই কামনা করেন।"—মনুসংহিতা ও মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিতেও ভারতের গুণ-গরিমার নানা বর্ণনা আছে। বাহুল্য-ভয়ে সে সব আর এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সংস্কৃতভাষায় রচিত ঐ সব স্বদেশ-বন্দনার বিন্দুমাত্র ছায়াপাতও একমাত্র ভারতচন্দ্র ব্যতীত বাঙ্গালার আর কোনও প্রাচীন কবির কাব্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্রে যাহা আছে, তাহা পরিমাণে যৎসামান্য হইলেও নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। তাঁহার 'অন্নদামঙ্গলে' তিনি বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম-কথা বলিতে গিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই চারি ছত্র লিখিয়াছেন,—

"সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ।।
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান।।"

ইহাতে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের যে স্তুতিটুকু দেখা যায়, তাহা স্বধর্ম্মানুরাগ-জনিত স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। দেশ-প্রীতির চেয়ে

গঙ্গা-প্রীতি ও ধর্ম্ম-প্রীতিই যেন ইহাতে প্রবল ও পরিস্ফুট। ইহা ছাড়া, তাঁহার বিদ্যা ও সুন্দরের কথোপকথন-মধ্যে এই যে কয় ছত্র পাওয়া যায়—

"এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ।।
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁই মাই কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা।।
গঙ্গাহীন সে দেশ, এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা-সম এ দেশের নীর।।

* * *

সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।।"

ইহা অবশ্য তেমন ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ইহাতে যে দেশ-প্রীতির পরিচয় আছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কাজেই সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে দেশ-ভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতির গান ও কবিতার ভারে বঙ্গভাষা আজ কিছু ভারাক্রান্ত, তাহার তেমন উন্মেষণের পরিচয় বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কবে ও কেমন করিয়া ইহার উন্মেষ ও বিকাশলাভ ঘটিল, সেই কথাই এইবার একটু ফুটাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

তবে প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে এটুকুও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, ভারতচন্দ্রের জন্মগ্রহণেরও পূর্ব্বে হিন্দী সাহিত্যে কিন্তু স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতিমূলক গান বা কবিতার কোনও অভাব ছিল না। বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালে কবি ভূষণদাস তাঁহার বীণায় জাতি-জাগরণের যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, তাহার ফলে সম্রাটের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ভূষণ স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। ছত্রপতি শিবাজী তাঁহার বীররসপূর্ণ কবিতাবলী-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দান করেন। ভূষণের কবিতা সে-সময়ে অনেকেরই প্রাণে স্বদেশানুরাগ সঞ্চারিত করিয়াছিল।

স্বাদেশিকতার সূচনা

লজ্জার কথা কি না, জানি না; কিন্তু ইহা সত্য কথা যে, ইংরেজের আমলে এবং ইংরেজের নিকটেই আমরা স্বদেশের ও স্বাধীনতার মাহাত্ম্য

কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন,—"নব্য বঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষা-গুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষা-গুরু—রামমোহন রায়; দ্বিতীয় দীক্ষা-গুরু—ডি. রোজিও; তৃতীয় দীক্ষা-গুরু—মেকলে। তিন জনেই তাঁহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয়, এবং প্রতীচীতে যাহা কিছু আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"—কথাটা খুব ঠিক। তবে এই শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আমরা যে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা নহে। প্রতীচীর অনেক কু-সামগ্রীর সঙ্গে দুই-একটা ভাল জিনিষও এদেশে আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দেশবাৎসল্যের নাম করিতে পারি। ইহার প্রথম ও প্রধান দীক্ষা-গুরু—হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ডি. রোজিও সাহেব। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গী ও ধর্ম্মে খৃষ্টান হইলেও ভারতকে তাঁহার স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন এবং ভালবাসিতেন। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে, তাঁহার রচিত 'Fakir of Jangheera' নামক কাব্যের মুখবন্ধে তিনিই এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রথম শুনাইয়াছিলেন,—

"My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast;
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery!

Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! one kind wish for thee."

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার এইরূপ বঙ্গানুবাদ করেন,—

'স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি

সে দিন তোমার; হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়!
বন্দিগণ-বিরচিত গীত-উপহার,
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন,
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন-অবশেষ,
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি!'

ডি. রোজিওর এই কবিতার কথা ছাড়িয়া দিলে এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেই আমাদের প্রথম মনে পড়ে। বঙ্গভাষায় তাঁহার রচনাতেই সর্ব্বপ্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব-বোধের পরিচয় পাই।

তাঁহার উপর ডি. রোজিওর কোনও প্রভাব পড়িয়াছিল কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন। তবে ডি. রোজিওর এই "Fallen country"র জন্য দুঃখ যে ব্যর্থ হয় নাই, তাহা তাঁহার শিষ্যগণের সংবাদ লইলেই বুঝা যায়। সেই কথাই এখানে একটু বলিব। তাহা হইলে ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিবার পক্ষে কতকটা সুবিধা হইতে পারে।

ডি. রোজিওর শিষ্যেরা প্রায় সকল বিষয়েই গুরুর অনুকারী ছিলেন। দেশ-বাৎসল্যের ভাবটুকুও তাঁহারা গুরুর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এদেশে এখন যেমন রাজনীতি বা প্রজানীতির আন্দোলন নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ডি. রোজিও সাহেবের সময়ে তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাঁহারই শিক্ষা-প্রভাবে তাঁহারই শিষ্যগণ হইতে উহার সূত্রপাত ঘটে। এই শিষ্যগণের মধ্যে রামগোপাল ঘোষের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রামগোপালই এদেশে স্বদেশী-বক্তারূপে প্রথম আবির্ভূত হন।

তবে এ প্রসঙ্গে এটুকু বলাও প্রয়োজন যে, রামগোপাল-প্রমুখ ডি. রোজিও-শিষ্যসকলের মনে যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়াছিল, তাহার ধাতুটুকু ছিল বিলাতী, এবং তাহা গুরু-প্রদত্ত শিক্ষারই ফল। তাঁহারা

গুরুর নিকট যেমন দেশকে ভালবাসিতে হইবে শিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার নিজেদের সমাজ, ধর্ম্ম, চরিত্র ও সদাচার প্রভৃতি ভাঙ্গিতে হইবে, ইহাও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ভাষা-প্রীতি যে স্বদেশ-প্রীতিরই একটি প্রধান অঙ্গ, এ ধারণা তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা সকলেই অল্প-বিস্তর সাহেবিয়ানার অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের স্বদেশ-প্রেমকে কতকটা ফিরিঙ্গী-তন্ত্রের বলিলে অন্যায় হয় না। এই কারণেই বোধ করি, বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন,—"রামগোপাল ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালাদেশে দেশ-বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-বাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ।"

মাতৃভাষায় দেশ-ভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস

বঙ্কিম বাবুর উপরি-উক্ত উক্তি সত্য। ঈশ্বর গুপ্ত কখনও স্বদেশহিতৈষীর অভিনয় করেন নাই; পরন্তু মনে-প্রাণে খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। তাই তাঁহার দেশ-বাৎসল্যও বিশুদ্ধ ছিল। তিনি দেশের ধর্ম্ম, দেশের ভাষা ও সামাজিক বিধি-নিষেধ প্রভৃতিকে ভুলিয়া বা ঘৃণাপ্রযুক্ত বর্জ্জন করিয়া দেশকে ভালবাসেন নাই; পক্ষান্তরে ঐ সকলের প্রতি মমতাপ্রযুক্তই স্বদেশপ্রেম-গীতি তিনি আরম্ভ করেন। ভারত জাগাইবার এই করুণ প্রার্থনা তাঁহার নিকট হইতে আমরা প্রথম শুনি,—

"জাগ, জাগ, জাগ, নব ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হ'য়ে, ঘুমাও না আর।।
তোল, তোল, তোল মুখ, খোল রে লোচন!
জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন।।
ভেঙ্গেছে শোবার খাট, পড়িয়াছ ভূমে।
এখনো তোমার এত সাধ কেন ঘুমে?"

ইহা পরাধীনতা-জনিত দুঃখানুভূতির ফল নহে। দেশবাসী ফিরিঙ্গী-ভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে, এই বেদনা-বোধ হইতেই ইহার

উৎপত্তি। তাই তাঁহার রচনার আর একস্থানে আমরা দেখিতে পাই তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি,
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হ'য়ে?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
মিছে কেন মর ভার ব'য়ে?
পূর্ব্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্ব রীতিনীতি, অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি,
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথহত।।
দেশের দারুণ দুঃখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লান মুখ মসী ছাঁদে,
শোক-অশ্রু করে বরিষণ।"

এই কবিতাটি মনে হয় দেশ-বাৎসল্যের আদি বাঙ্গালা গান—স্বধর্ম্মানুরাগ-জনিত দেশ-প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। এইজন্য ইহার জন্ম-দিনটিও বাঙ্গালীকে এখানে শুনাইয়া রাখিতেছি যে ১২৫৫ সালের ১লা বৈশাখ ইহা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতা-প্রকাশের প্রায় ছয় বৎসর পরে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র যখন তৃতীয় বর্ষ, সেই সময়ে সিপাহীর যুদ্ধ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "এ সময় এদেশে দেশ-বাৎসল্যের বড় অভাব।" অথচ সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে সুরে দেশ-বাৎসল্য ও জাতি-বাৎসল্যের গান ধরেন, সে সুর সত্যই অভিনব ও অতুলনীয়। বিজেতা বিদেশীরা আমাদিগের প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হইয়া আচরণ করুক, আর নাই করুক, সে দিকে ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টি ছিল না। তিনি দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।"

এই কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে লিখিয়াছিলেন—"এখনকার কয় জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয় জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ?"—ইহার প্রত্যেক অক্ষরটি এখনও সত্য। বিশেষতঃ বর্ত্তমানে বিশ্বপ্রেমের যেরূপ ধুয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অনেকে হয়ত 'বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' কথাটার মধ্যে বিজাতি-বিদ্বেষের গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু ইহা কতকটা সেই সেকেলে জাতি-বৈর-ভাবেরই অভিব্যক্তি। যে জাতি-বৈর আমাদের ও বিদেশী বিজেতার মাঝখানে বিবিধ বিধি-নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া বিদেশীয় সকল রকম আকর্ষণ হইতে আমাদিগকে কেবল দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত, ইহা সেই জাতি-বৈর। ইহা গুপ্ত-কবির মনে যে সহসা অকারণ উদিত হইয়াছিল, তাহা নহে। বাঙ্গালার সমাজক্ষেত্র হইতেই ঐ ভাবের প্রেরণাটুকু তিনি তখন লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যখন বিলাতী ঠাকুরদিগকে মনুষ্যজাতির আদর্শ ভাবিয়া, তাহাদের একান্ত অনুচিকীর্ষু হইয়া, নিজেদের জাতিগত, ধর্ম্মগত ও ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য হারাইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মমতাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, তখন একা গুপ্ত-কবিই বাঙ্গালীর কর্ণে ঐ স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার মন্ত্রটুকু শুনাইয়াছিলেন। বেদনার আঘাতে তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া ঐ ভাব-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি-স্তোত্র কেবল স্তুতি বা প্রশংসার পুষ্পগুচ্ছ নহে,—তাহাতে মায়ের রূপ-বর্ণনারও কিছুমাত্র ঘটা নাই। মাতার প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা, দেশ-জননীর প্রতি দেশবাসীর অন্তরে সেই ভালবাসার অভাব অনুভব করিয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন—

"জান না কি জীব তুমি জননী জনমভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?"

ইহা মর্ম্ম-বেদনারই অশ্রু-নির্ঝর। এই মর্ম্ম-যাতনার পরিচয় ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য ও পদ্য বহুবিধ রচনায় পরিস্ফুট। 'থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে'—দেশবাসীর সম্বন্ধে এই মর্ম্মান্তিক উক্তিকে আরও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পর্য্যন্ত অনেকেই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে একমাত্র

ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া আর কাহারও কলম হইতে অমন কথা বাহির হয় নাই। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গুপ্ত-কবি আমাদিগকে মনুষ্য-আখ্যার উপযোগী হইবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল কতকটা সেই ভাবের ভাবুক হইয়া সেদিনও আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ!" ঈশ্বর গুপ্তও স্বদেশবাসীকে 'জীব' বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন,—'মানুষ' বলিতে তাঁহার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু কিসের জোরে এই জীব 'মানুষ'-নামের যোগ্য হইতে পারে, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি এই ভাবে দিয়াছিলেন,—"মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থ অত্যন্ত অনুরাগী। অপিচ মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"—সুতরাং গুপ্ত-কবির ভাব-ধারা যে এ যাবৎকাল পারম্পর্য্যের পথ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এ কথা বলিলে বোধ করি দোষের হয় না। বঙ্গসাহিত্যে এ বিষয়ের তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শক।

হেমচন্দ্রের মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারত-বিলাপ গায় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ "ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়" বলিয়া করুণ স্বরে ডাকে নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভারতকে জননী সম্বোধনে ডাকিয়াছিল কিনা জানি না। তিনি যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই স্রোত একটানে বহিয়াছে।"—এ কথা কিন্তু সমীচীন নহে। ঈশ্বর গুপ্তই এদেশে সর্ব্বপ্রথম 'ভারতকে জননী সম্বোধনে' ডাকিয়াছিলেন এবং ভারতের জন্য বিলাপও করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ভারতের ভাগ্যবিপ্লব,' 'ভারতের অবস্থা' 'ভারত-ভূমির দুর্দ্দশা,' 'ভারত-সন্তানের প্রতি' ও 'স্বদেশ' শীর্ষক কবিতাগুলি এই কথারই চিরকাল সাক্ষ্য দিবে।

স্বাধীনতার গান ও দেশ-প্রীতির নূতন রাগিণী

ঈশ্বর গুপ্তের দেশাত্মবোধের গান থামিতে না থামিতে উহাকে যাঁহারা আরও জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গুপ্ত-কবির শিষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিম, দীনবন্ধু,

রঙ্গলাল ও মনোমোহন বসুর নাম করিতে পারা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে রঙ্গলালের নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত-কবির বিয়োগ-বৎসরেই তিনি গুরু-প্রদত্ত ভাব-বস্তুতে উদ্দীপনার গরম মশলা মিশাইয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে—
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়!
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়!"

তাঁহার আর এক কবিতার একস্থলে আছে—

"সার্থক জনম আর বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার।"

বঙ্গসাহিত্যে এ উদ্দীপনা ছিল না,—এইরূপ স্বাধীনতার গানও ছিল না। রঙ্গলাল হইতেই এই দুইটা জিনিষের প্রথম আমদানী হয়। ১২৬৫ সালে তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়। তাহাতেই ঐ উদ্দীপনাপূর্ণ কয় ছত্র আছে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশভক্তি শান্ত ও করুণ; রঙ্গলাল তাহাতে কতকটা রৌদ্ররসের পালিশ চড়াইয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে কয়েকটি হিন্দু বীরের ছবি ধরিয়াছিলেন। স্বজাতি-বৎসল হও, স্বদেশ-প্রেমিক হও, এ সব কথা রঙ্গলালের লেখায় বেশী নাই বটে, কিন্তু ঐ সকল উপদেশের উপাদানে মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা তাঁহার কাব্য-গাথায় যথেষ্ট আছে। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি ভারত-ইতিহাসের 'মণিপূর্ণ খনি' হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে "কর্ম্মদেবী", "সুরসুন্দরী" ও "পদ্মিনী উপাখ্যান" উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন। তিনি 'কুমারসম্ভবে'র বঙ্গানুবাদ যে করিয়াছিলেন, তাহাও দেশাত্মবোধের প্রেরণায়। নিজেই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"আমরা ভিন্ন দেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি পরিহার-পূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহু রূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে

কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা-করণে স্বদেশহিতৈষী মাত্রের মনে বাসনা জন্মে; সেই বাসনা পূর্ণ-করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সর্বিশেষ শক্তি রাখে। তন্নিমিত্তে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ-করণে প্রবৃত্ত হই।" সুতরাং বলিতে পারা যায়, ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় রঙ্গলালও অনুচিকীর্ষার বশে নহে—পরন্তু অনুচিকীর্ষার প্রতি কতকটা ঘৃণা-প্রযুক্তই যেন সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-প্রকাশের প্রায় ৪।৫ বৎসর পরে মাইকেল মধুসূদন ইউরোপ-গমনকালে জন্মভূমির উদ্দেশে বলিয়াছিলেন,—

রেখ মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?
চির স্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও স্বদেশের প্রতি মাইকেলের মমতা ছিল। যাহা হউক, উপরি-উক্ত কবিতা-রচনার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে, 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-প্রকাশের তিন বৎসর পরে তাঁহার "মেঘনাদ বধ" কাব্য প্রকাশিত হয়। ইহার ষষ্ঠ সর্গের অনেক স্থলই জাতি-প্রীতিতে ওতপ্রোত। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত বাল্মীকির রামায়ণে আছে, মেঘনাদ বিভীষণকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—"তুই যখন আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের দাসত্ব করিয়াছিস্, তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজন-সংস্রব আর কোথায়ই বা পর-সংস্রব; তুই নির্ব্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস্ না। পর যদি গুণবান্ হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পর যে, সে পরই।"—এ জিনিষ কৃত্তিবাসের রামায়ণে নাই। এই ভাবটুকুকে আরও

জাতীয়তার রঙে রঞ্জিত করিয়া মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদ বধে' অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদও বিভীষণকে বলিয়াছেন,—

> "—শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
> পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
> নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ; পর, পর সদা।"

'মেঘনাদ বধ'-প্রকাশের কয়েক মাস পূর্ব্বে—অর্থাৎ, ১২৬৭ সালে দীনবন্ধুর অমর নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর "কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গদেশ" অনেকের মনে না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার 'নীলদর্পণে' নীলকর-নিপীড়িত প্রজার জন্য যে বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। ইহার গানেও বেশ একটু জাতি-বাৎসল্যের পরিচয় আছে। বাঙ্গালা নাটকে এ জিনিষ পূর্ব্বে ছিল না। 'নীলদর্পণ'-প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু মহাশয় একবার এক থিয়েটারের বিজ্ঞাপন-পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"নীলদর্পণ কি করিয়াছে? হাতি ঘোড়া এমন কিছু বেশী নয়, তবে বাঙ্গালীর মূর্চ্ছাগত মনকে প্রথমে একটু মনুষ্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী দেশের দুঃখে কাঁদিতেছে, 'ভারত' 'ভারত' বলিয়া একটু হাত পা নাড়িতেছে, নীলদর্পণ-অভিনয়ের পূর্ব্বে এই অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল? কই,—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বের খাতা-পত্র দেখিলে এ হিসাব তো তত বেশী জমা দেখা যায় না; যেটুকুও দেখা যায়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে নাটকাকারে নীলদর্পণ গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"—এই উক্তির শেষাংশে সামান্য অত্যুক্তি থাকিলেও মোটের উপর উহা অসত্য নহে।

ঈশ্বর গুপ্তের পর রঙ্গলাল, রঙ্গলালের পর মধুসূদন ও দীনবন্ধু, এবং এই দুই কবির পরই আমরা হেমচন্দ্রের বীণায় স্বদেশ-প্রীতির ঝঙ্কার শুনিতে পাই। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' ও দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'—এই দুই গ্রন্থ-প্রকাশের প্রায় চারি বৎসর পরে—অর্থাৎ, ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' প্রকাশিত হয়। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বা মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের ন্যায় ইহা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আখ্যানমূলক নহে। এ কাব্য-গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র নিজেই ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন,—"উপাখ্যানটি

আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাস-মূলক নহে। পুরাকালে হিন্দু-কুল-তিলক বীরবৃন্দ স্বদেশ-রক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।”— সুতরাং কাব্যাংশে যেমনই হউক, বিষয়-হিসাবে যে এই কাব্যখানি অভিনবত্বের দাবী করিতে পারে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ‘পদ্মিনী উপাখ্যানে’র উদ্দীপনা ইহাতে নাই বটে, তবে ইহাতে আর একটি যে জিনিষ আছে, তাহা রঙ্গলালের রচনা-মধ্যে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। রঙ্গলালের রচনায় স্বদেশ-প্রীতিমূলক উচ্ছ্বাস যথেষ্ট আছে, কিন্তু স্বদেশ-বন্দনা নাই। ‘বীরবাহু’তে তাহাই আছে। ইহার নায়ক জন্মভূমির উদ্দেশে বলিতেছে,—

“রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলঙ্কার।।
উচ্চ হিমগিরি-চূড়া হিমানী-মণ্ডিত।
গর্ব্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত।।
অরুণের রথ-রোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি।।
গোমুখী-বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবারাতি কলনাদে করিতেছে কেলি।।
নর-অংশে জন্ম সেই রাম-নারায়ণ।
তোমারে জননী-ভাবে করিলা পালন।।

* * *

এবে সেই দেশমান্যা ভারত-বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে।।”

‘বীরবাহু’ কাব্যে দেশ-ভক্তির এই করুণ সুর শুনাইয়া হেমচন্দ্র কিছুকালের জন্য তাঁহার বীণাকে বিশ্রাম দিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য সে সময়ে বঙ্গভাষায় দেশ-প্রীতি বা দেশ-ভক্তির গান-রচনা যে একেবারে বন্ধ ছিল, তাহা নহে। সাহিত্য-কুঞ্জের আর একদিক হইতে একটু অভিনব সুরে দেশ-ভক্তির তান উঠিয়াছিল। তাহারই পরিচয় এখানে দিয়া পরে হেমচন্দ্রের কথা আবার আমাদিগকে বলিতে হইবে।

‘বীরবাহু’ রচনার প্রায় দুই বৎসর পরে,—অর্থাৎ, ১২৭৩ সালে মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় “শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনে"র উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রস্তাব লিখিয়া পুস্তিকাকারে তাহা প্রকাশ করেন। ইহারই ফলে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে নবগোপাল মিত্র কর্ত্তৃক 'হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা' সংস্থাপিত হয়। এই সভার প্রথম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত এই গানটি গীত হইয়াছিল,—

"মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত! তোমারি।
রাত্রিদিবা ঝরিছে লোচন-বারি।।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে।
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি!
এ দুঃখ তোমার হায় রে, সহিতে না পারি।।"

এই গান পরে 'ভারত-মাতা' নামে ক্ষুদ্র নাট্য-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। তারপর এই মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন-উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন,—

মিলে সবে ভারত-সন্তান
এক তান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।।

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

কেন ডর, ভীরু! কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

হোক্ ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।”

এই সঙ্গীতের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ‘বঙ্গদর্শনে’ লিখিয়াছিলেন,—“এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক! হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী-তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক! পূর্ব্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র উহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।” বঙ্কিমচন্দ্রের এ উচ্ছ্বাস একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। জাতীয় মহাসমিতিতে এই সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় ইহাই প্রথম জাতীয় মিলন-সঙ্গীত। ভারত-মাতার উদ্দেশে ইহাই হইতেছে প্রথম আশা-উৎসাহপূর্ণ জয়-ঘোষণার গান।

স্বদেশ- ও স্বজাতি-অনুরাগের রাগিণীতে বাঙ্গালার কবিতা-কুঞ্জ যখন এইরূপে জমিয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে—অর্থাৎ, ১২৭৫ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ‘এডুকেশন গেজেটে’র পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ভূদেবের এই অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রেরও পুনরভ্যুদয় আমরা দেখিতে পাই। ভূদেব বাবু তাঁহার বন্ধু ও বাল্য-সহপাঠী রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “আর্য্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদায় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ।” তিনি আরও লিখিয়াছিলেন,—“ভারতবাসী ‘জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়’ বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না, পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।”

এমন সাত্ত্বিক ভাবপূর্ণ স্বদেশ-প্রীতির কথা ভূদেব বাবুর পূর্ব্বে আর কাহারও মুখ হইতে প্রচারিত হয় নাই। এই স্বদেশপ্রেমে ‘জাতি-বৈরে’র গন্ধমাত্র নাই। কিন্তু এই ‘এডুকেশন গেজেটে’ই কবিবর হেমচন্দ্র জাতিবৈর-জনিত দেশ-ভক্তির গান লিখিতে আরম্ভ করেন।

তাঁহার 'বীরবাহু কাব্যে' যাহার অংকুর দেখা গিয়াছিল, 'এড়ুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত তাঁহার 'ভারত-সঙ্গীত' ও 'ভারত-বিলাপ' কবিতাদ্বয়ে তাহারই বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। এই দুইটি কবিতা ১২৭৭ সালের 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম মুদ্রিত হয়। রঙ্গলালের নব সৃষ্ট উদ্দীপনায় এই কবিতা দুইটি নূতন ইন্ধন যোগাইয়াছিল। 'ভারত-সঙ্গীতে'র এই সব ছত্র—

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি ;
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।
হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্য-বলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

* * *

আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে, করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

* * *

"হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!
আর কি ভারত সজীব আছে?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদ-ভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।।

*　　　　*　　　　*

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও?
অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত;
সে জাহ্নবী-বারি এখন(ও) ধাবিত
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

তারপর তাঁহার 'ভারত-বিলাপে'র এই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি—

"দেখ্‌, চেয়ে দেখ্‌ প্রাচীন বয়সে,
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে,
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।
আগে ছিল রাণী—ধরা-রাজধাণী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী,
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা।

তোমারো ত বুকে কত শত বার—
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার
এই কথা সদা করিও ধ্যান।
ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
বাজিত গরজি—উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ।"

'ভয়ে ভয়ে লিখিত' হইলেও ইহার ঝঙ্কার ভারতের না হউক, বঙ্গের অনেক ব্যথিত চিত্তকেই তখন কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

তখনকার দিনে এই সব কবিতা অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীরই মুখে মুখে ফিরিত। হেমচন্দ্রের এই কবিতার অনুসরণে সে সময় কত কবি ও অকবি কত কবিতা যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিসাব করিয়া বলা সুকঠিন।

সাহিত্যাকাশে হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র—এই দুইটি চন্দ্রের উদয় প্রায় এক সঙ্গে ঘটে। ইঁহারা উভয়েই সমবয়স্ক। হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু-কাব্য'-প্রকাশের প্রায় এক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা'য় স্বদেশ-প্রীতি-পরিচায়ক তেমন কিছু না থাকিলেও তাঁহার 'মৃণালিনী'তে উহার আভাস আছে। 'ভারত-সঙ্গীত' ও 'ভারত-বিলাপে'র ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ, ১২৭৬ সালে 'মৃণালিনী'র প্রকাশ। ইহাতে যে পশুপতি-চরিত্র আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর স্বদেশানুরাগই তাহার স্রষ্টা। অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার 'নবজীবনে' ঠিকই লিখিয়াছিলেন—"যে মনোবৃত্তি হইতে বঙ্গদর্শনের 'ভারত-কলঙ্ক', প্রচারের 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' শীর্ষক প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে উক্ত পত্রদ্বয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, ঠিক সেই মনোবৃত্তি হইতেই পশুপতি উদ্ভূত। বঙ্গদেশের ভীরুতাপবাদ যে অমূলক, বঙ্গদেশ যে কেবলমাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই, গ্রন্থকার এই কথাটি যেন বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের হৃদয়েই গাঁথিয়া রাখিবার জন্য পশুপতি-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।"

'মৃণালিনী'র প্রথমাংশে দেখি, পশুপতি ইষ্টদেবীর স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—"আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও

মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জীবনস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না।" কিন্তু পশুপতির মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। বখ্‌তিয়ারের হস্তে নবদ্বীপ-জয় যখন সম্পন্ন হইল, তখন পশুপতির মুখ দিয়া কিছু না বলাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন,—"যে সূর্য্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম।"—দেশের জন্য এই দুঃখ ও আশা বুকে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় ইহার তিন বৎসর পরে 'বঙ্গদর্শন' কাগজ বাহির করেন। বঙ্গসাহিত্যে এ যুগের তুলনা নাই। এবার সেই কথাই বলিতে আরম্ভ করিব।

বঙ্কিম-যুগ

১২৭৯ সালে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' লইয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে উপনীত হইলেন। বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বে কেহ বঙ্গভূমির উদ্দেশে, কেহ বা ভারতভূমির উদ্দেশে বাঙ্গালা গানে ও কবিতায় নানা স্তব ও ব্যথা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর 'বন্দে মাতরম্' এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে ইহা রচিত। এই গানের লক্ষ্য বঙ্গভূমি—ভারতভূমি নহে। বঙ্গদেশের উদ্দেশে তিনি যে ভাবে যতটা 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছেন, তেমন ভাবে ততটা আজ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও ডাকিতে দেখি নাই। প্রথমতঃ তাঁহার মাসিক পত্রের নামকরণেই তাঁহার বঙ্গ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গদেশের জন্য শোক করিতে দেখি,—বঙ্গদেশকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনি। তিনি ইহাতে লিখিয়াছিলেন,—"গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে? যে মনুষ্য জননীকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য-মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতি-মধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া রোদন করিলাম।" বঙ্গ-জননীর জন্য এই দুঃখের রোদন তিনি আজীবন করিয়াছিলেন। বঙ্গ-সন্তান যাহাতে মানুষ হইয়া মায়ের দুঃখ ঘুচাইতে পারে, সেই কথা তিনি নানা ভাবে নানা রচনার ভিতর দিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আগরার তাজমহলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনেক বাঙ্গালী কবি ও লেখক অনেক প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসি, তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে-সকল রাজ্যের রক্ত শোষণ করিয়া এই রত্ন-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য?"—বঙ্কিম ব্যতীত এমন কথা আর কোনও বাঙ্গালীর মুখে কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি?

মেকলে সাহেব এক সময়ে বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, কাপুরুষ প্রভৃতি গালি দিয়া ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে উহা বেদবাক্য-স্বরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্ব-প্রথম তাহার প্রত্যুত্তরে সিংহ-বিক্রমে গর্জ্জিয়া বাঙ্গালীকে প্রথম শুনাইয়াছিলেন,—"যে বলে, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। তাহার কথা মিথ্যা।"—শুধু এইটুকু বলা নহে। মেকলের রচিত ঐ মিথ্যা অপবাদকে বাঙ্গালীর মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি 'সীতারাম', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী-চৌধুরাণী'তে বাঙ্গালীর বীরত্ব-ছবি অঙ্কিত করিয়া তাহা বাঙ্গালীর মানস-নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন।

কমলাকান্ত-রূপে তাঁহাকে বঙ্গ-জননীর জন্য যে শোক করিতে দেখি, সে শোকের একটু পরিচয় এখানে দিতেছি।—"আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি? এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজ দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ ভুজা, নানা-প্রহরণ-

প্রহারিণী, শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-রূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ! আমি সেই কাল-স্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।”

“কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎ-সমীপে প্রকাশ কর! এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি,—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারু-পূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধুপূজিতে সিন্ধুমথন-কারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদ-প্রান্তে লুণ্ঠিত করিব,—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব,—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো!—যাহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?”

“দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল-জলরাশি ব্যাপিল, জল-কল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে সজল নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব—সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়-ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ, উঠ, মা, উঠ বঙ্গজননি!”

উপরি-উদ্ধৃত কমলাকান্তের উক্তিতে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বঙ্গ-জননীর জন্য বঙ্কিমের বিশাল হৃদয়ের গভীর শোক

উহার ছত্রে ছত্রে স্পন্দিত হইতেছে। উহা যে শুধু শোকেরই অভিব্যক্তি, তাহা নহে। বঙ্গ-জননীর উহা এক অপূর্ব্ব স্তবও বটে। পাঠকসকলকে এই স্তবের সহিত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের স্তব একবার মিলাইয়া পড়িতে আমরা অনুরোধ করি। তাহা হইলে, তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঐ উভয় স্তবে একই মায়ের ছবি সুপ্রকট,—শুধু আঁকিবার প্রণালী বিভিন্ন।

কমলাকান্তের দেশ-মাতৃকার বন্দনা ইতঃপূর্ব্বে আপনাদিগকে শুনাইয়াছি। এবার বঙ্কিমের চির-নূতন ও চির-মধুর 'বন্দে মাতরম্'-গানটি উহার সহিত মিলাইয়া পাঠ করুন,—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং,
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে?
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্।
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ।।
বন্দে মাতরম্ ।।

প্রায় চৌষট্টি বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র—বাঙ্গালার এই দুই মহাকবির মধ্যে একদিন এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিলঃ—

হেমচন্দ্র—বর্ত্তমান সময়ে যে সকল স্বদেশপ্রেম-ঘটিত কবিতা বাহির হইতেছে, তাহা বাহির না হইলেই ভাল হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র—কেন?

হেমচন্দ্র—যে স্বদেশপ্রেম, যে বীরত্ব বাক্যে পর্য্যবসিত, তাহা ঘৃণার বস্তু, তাহা এক রকম ভণ্ডামি।

বঙ্কিমচন্দ্র—তবে তুমি তোমার 'ভারত-সঙ্গীত', 'ভারত-বিলাপ' লিখিয়াছিলে কেন?

হেমচন্দ্র—আমি লিখিয়া অতি অন্যায় কাজ করিয়াছি, আমি তাহার জন্য অনুতপ্ত। হায়, বঙ্গদেশে একটা লোক নাই, যে কার্য্যে বীরত্ব দেখাইতে পারে; একটা লোক নাই, যে প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য নিজের জীবনটা দিতে পারে। যে-দেশের লোকের অবস্থা এইরূপ, সেদেশের লোক 'জাতীয় সঙ্গীত' লেখে কেন? স্বদেশপ্রেমের বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা করে কেন? শোচনীয়!

বঙ্কিমচন্দ্র—তুমি কি বলিতে চাও, সাহিত্য-দ্বারা কার্য্যত দেশের কোন মঙ্গল হয় না? যদি তা বল, তাহা হইলে আমি তোমার কথা কখন অনুমোদন করিতে পারি না। যদি সাহিত্য-দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা যায় না মনে করিতাম, তাহা হইলে আমি আনন্দমঠ লিখিতাম না। আমার বিশ্বাস, আমার আনন্দমঠে স্বদেশের একদিন উপকার হইবে।*

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে কিরূপ সত্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমরা বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' গান আনন্দমঠের মেরুদণ্ড। এই স্বর্গীয় সঙ্গীত সে সময়ে দেশবাসীর মনে যে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল, তাহা কখনও

* জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়-লিখিত "আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম"—বঙ্গদর্শন, ১৩১৩।

ভুলিবার নহে। 'বন্দে মাতরম্'-ধ্বনি বন্ধ করিবার জন্য পুলিশেরা লাঠির আঘাতে বাঙ্গালীর ছেলেকে নিপীড়িত করিয়াছে—তাহাদের দেহে রক্তের ধারা ছুটাইয়াছে, কিন্তু তবু তাহারা দমিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, সেই আঘাতের প্রতিঘাতে তাহারা 'বন্দে মাতরম্'-শব্দে আকাশ প্রতি-ধ্বনিত করিয়াছিল। এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া 'হিতবাদী'র কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ তখন গান লিখিয়াছিলেন,—

"মাগো, যায় যেন জীবন চ'লে,
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' ব'লে।

* * *

আমায় বেত মেরে কি 'মা' ভোলাবে?
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?"

স্বদেশী-আন্দোলনের কথা বলিতে গিয়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'A Nation in Making' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একস্থানে 'বন্দে মাতরম্'-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাহার মর্ম্ম এই যে, 'পূর্ব্ববঙ্গের নব-গঠিত শাসন-বিভাগ-কর্ত্তৃক যখন ঘোষিত হয়—জন-সাধারণের নিকট 'বন্দে মাতরম্'-ধ্বনি করা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, সে সময়ে এই নিষিদ্ধ ধ্বনি সমগ্র ভারতের জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়াছিল এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া কোথাও মিলিত হইলে প্রত্যেকের মুখেই তখন এই ধ্বনি শোনা যাইত। ইহা বাঙ্গালা সঙ্গীত হইলেও এত সংস্কৃতবহুল যে ভারতের যে-কোন স্থানের শিক্ষিত ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে। ইহার সুন্দর শব্দ-বিন্যাস, মধুর ছন্দ এবং সর্ব্বোপরি গভীর স্বদেশানুরাগ ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে।'

আধুনিক অনেক পাঠকই বোধ হয় জানেন না যে, এই স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতেই বাঙ্গালী 'বন্দে মাতরম্'কে মন্ত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি বলিতে আরম্ভ করে। এই সঙ্গীতের দেবতা যদিও বঙ্গভূমি, কিন্তু বঙ্গমাতাকে আশ্রয় করিয়া বঙ্কিমের কবি-প্রতিভা যে অপূর্ব্ব রস-মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বঙ্গের

ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নহে। সুরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইহার 'গভীর স্বদেশানুরাগ ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে।'

"স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত"—ইহাই ছিল বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রধান বাণী। এ প্রসঙ্গে তাঁহার কথা বুঝি বলিয়া শেষ করিবার নহে। শুধু তাঁহার কথাই বা কেন বলি? এ বিষয়ে যাঁহারা তাঁহার প্রধান সহায় ও সহচর ছিলেন—অর্থাৎ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—তাঁহারাও এক একজন দিক্‌পাল-বিশেষ। তাঁহাদের দেশাত্মবোধের কথা বিশ্লেষণ করিয়া বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে গেলে এক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। এক্ষেত্রে ঠিক তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। দেশাত্মবোধের ভাব-পারম্পর্য্যের ধারাটুকু ব্রিটিশ-যুগের বঙ্গসাহিত্যে কিরূপে সূচিত হইয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই কথাই আলোচ্য গ্রন্থে সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে—১২৮১ সালে, হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহার' প্রকাশিত হয়। 'বৃত্র-সংহারে'র কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না। অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন,—"দেবারাধনা বা পরহিত-ব্রত 'বৃত্র-সংহারে'র আসল কথা হইলেও ঐ দুটি কথা লুকান ছাপান আছে। কিন্তু জাতি-বৈর কাব্যে ওতপ্রোত।"—ইহা অসত্য বা অত্যুক্তি নহে। 'বৃত্র-সংহারে'র প্রথম সর্গে দেব-সেনাপতি স্কন্দ স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেবতাগণকে বলিতেছেন,—

"ধিক্ দেব! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে,
দেবত্ব, ঐশ্বর্য্য, সুধা, স্বর্গ তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি!

* * *

ধিক্ হে অমর-নামে, দৈত্য-ভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় এতই পরাণে,
অমরতা-পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদাঙ্কিত পৃষ্ঠ, চির নির্ব্বাসন!

* * *

বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
এইরূপে চিরদিন থাকিবে কি হেথা?

চির অন্ধতম পুরী এ পাতাল দেশে,
দনুজের পদ-চিহ্ন ললাটে আঁকিয়া?"

পরাধীনতার বেদনা-বোধ-জনিত এই দেশবাৎসল্য 'বৃত্র-সংহারে'র যেন মূল ভাব-বস্তু।

এই 'বঙ্গদর্শনে'র যুগেই নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের কবিতা গৈরিক নিস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্‌গীর্ণ করিয়াছিল। তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতী' এ কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন,—"নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য-স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনি রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসা-প্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশ-বাৎসল্য নবীনবাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্য-মধ্যে (পলাশীর যুদ্ধে) বিকীর্ণ হইয়াছে।"

বঙ্কিমবাবুর এ বিবৃতি-মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই। ১২৮০ সালের দ্বিতীয় বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' নবীনচন্দ্রের 'অনন্ত দুঃখ' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে গিয়াও কবি দেশের দুঃখে না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন নাই। কবিতার শেষাংশে তিনি তাঁহার স্বর্গগত বন্ধু দীনবন্ধুকে বলিয়াছেন,—

"এক অনুরোধ সখে!—তুমি চিরদিন
দুঃখিনী বঙ্গের দুঃখে করেছ রোদন,
এখনো সে অশ্রুজল, করে যেন ছল ছল
নেত্রে তব ; কাঁদাইয়া সে দীন-নয়ন
জিজ্ঞাসিও বিধাতারে—"আর কতদিন—
আর কতদিন এই দুঃখের অনল
রবে প্রজ্বলিত বঙ্গে? শুনিয়াছি ভবে
সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে বাঁচে,
ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে,
বঙ্গের কি দুঃখ আহা! অনন্ত কেবল?"

আবার ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' নবীনচন্দ্রের "চিহ্নিত সুহৃদ্" নামে যে কবিতা প্রকাশিত হয়, তাহাতেও দেখিতে পাই, কবি পাশ্চাত্ত্য-দেশ-প্রত্যাগত তাঁহার কোনও এক বন্ধুর উদ্দেশে বলিতেছেন,—

"গ্রীসের গৌরব-শ্মশান-যুগল—
স্পার্টা, এথেন্স—করিয়া দর্শন,
ঝরিল না, সখে! নয়নের জল,
হস্তিনা, অযোধ্যা, করিয়া স্মরণ?

*   *   *

যাক্ সেই দুঃখ, কি হবে বলিয়া?
বল সখে, তব আছে কি স্মরণ?
যাইতে ইংলণ্ডে, অশ্রুতে ভাসিয়া
বলেছিলে—মনে আছে কি এখন?
বলেছিলে—"মাতঃ ভারত-দুখিনি!
তব দুঃখে মাতঃ হৃদয় বিকল;
সহিতে না পারি, দিবস-যামিনী
ভারত-বৈধব্য—মাতৃ-চিতানল।"

*   *   *

অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি,'
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া;
জগৎ-জীবন ইউরোপে ভ্রমি,'
আসিয়াছ সখে, কি ফল লভিয়া?
শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন,
শিখেছ গণিতে নক্ষত্রমণ্ডল,
কিন্তু তাহে সখে, হ'বে কি বারণ
'মাতার রোদন,—মাতৃ-চিতানল?'

*   *   *

ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার—প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য-বল?

কই ইংরাজের তীক্ষ্ন তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহ-চর্ম্মে তুমি মেষ অল্প-প্রাণ!

*   *   *

হয়েছ "চিহ্নিত"!—কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে সখে, হইবে না ছিন্ন,
দীনা ভারতের অদৃষ্ট-শৃঙ্খল।"

পরাধীনতার এই তীব্র জ্বালা নবীনের বহু রচনায় সুপ্রকাশিত। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে তিনি মোহনলালের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—

"আর ভারতের?—সেই চির-অধিনীর?
ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর
কিবা সুখ, কি অসুখ?—সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গ-বাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরক-বাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হ'তে সুখী সমধিক।
চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।"

মিল্টনের "Paradise Lost" -এর প্রথম ভাগের একস্থানে আছে,— "Better to reign in hell, than to serve in Heaven." —মোহনলালের উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে ইহারই কতকটা প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

নবীনচন্দ্রের 'রঙ্গমতী'তে দেখিতে পাই, তাহার নায়ক জন্মভূমির উদ্দেশে বলিতেছে,—

"ছিল না জননী মম, ছিল জন্মভূমি,
ছাড়িলাম তাও এই দ্বাবিংশ বয়সে—

* * *

কাঁদিল হৃদয়। আছে কি মানব হেন
এই ভূমণ্ডলে, দেবি, হায় রে যাহার,
তেয়াগিতে জন্মভূমি, না কাঁদে পরাণ?
বনের বিহঙ্গ কিংবা পশু বনচর,
না চাহে ত্যজিতে যদি দুস্তর কান্তার,
বিশাল কণ্টকাকীর্ণ; তবে কেন হায়!
তেয়াগিতে জন্মভূমি তেয়াগিতে হায়!—
শৈশবে মায়ের কোল, প্রীতি-পারাবার;
কৈশোরের ক্রীড়াসন; বিদ্যার মন্দির;
সুখের যৌবনে চারু প্রণয়-উদ্যান
পরিমলময়, পূর্ণ পারিজাত-শোভা;
প্রৌঢ়ের দাম্পত্য-প্রেম; হায় স্থবিরের
জীবন-ঝটিকা-শেষে শান্তির আশ্রম;—
তেয়াগিতে ভগবতি, হেন জন্মভূমি,
কেন না কাঁদিবে বল মানবের মন?"

এই মর্মভেদী রোদন 'রঙ্গমতী'র অস্থি-পঞ্জর। 'রঙ্গমতী'র নায়ক বীরেন্দ্র একটি বাঙ্গালী যুবক। 'বান্ধব' লিখিয়াছিলেন—"বীরেন্দ্র আমাদের। আমাদের যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে। তাহাতে ফল কি? অতএব যাহা হইবে, যাহা হইব, যাহা আমাদের হইবার দিন আসিতেছে.........অনাগত বীর ও মনুষ্য।"—নেতাজীর কীর্ত্তি-কথায় সমগ্র দেশ এখন মুখরিত। এ সময়ে 'রঙ্গমতী' পড়িলে, কবিকে সত্যই 'Prophet' বলিতে ইচ্ছা হয়। বীরেন্দ্র আশার অবতার। বীরেন্দ্র মহাত্মা শিবাজীর মন্ত্র-শিষ্য। শিবাজী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"বীরেন্দ্র, দাসত্ব হইতে দস্যুত্ব উত্তম।"

১২৮৩ সালের 'বান্ধব' নামক মাসিকপত্রে নবীনচন্দ্রের 'শব-সাধন' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হইলে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার 'সাধারণী'তে লিখিয়াছিলেন—"একমাস হইল, আমরা সাধারণীতে বলিয়াছিলাম যে, এখন ভারত যেরূপ বিপন্ন, যেরূপ রোগগ্রস্ত, শব-সাধন ব্যতীত এ রোগের প্রতিকারের অন্য উপায় নাই। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে,

আমাদের সেই কথাগুলি নবীনচন্দ্রের উদ্দীপ্ত পদ্যে প্রদীপ্ত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন,—

"ভারতসন্তান! দেখ না মাতার
লোল জিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি' বিদারণ
করে, জননীর পিপাসা নিবারি'
ভারত-শ্মশানে শক্তি-আরাধন!"

এই সময়ে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার যে সরল, সুন্দর ও সতেজ গদ্যে স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ-যোগ্য। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার 'দশ মহাবিদ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারত-মাতারই চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। রামেন্দ্রসুন্দর এই রচনা-সম্বন্ধে এক সময়ে বলেন যে,—"সমস্ত ভারতভূমি যে আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আমাদের মা বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দ্দেশ আমরা দশ মহাবিদ্যা হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত 'দশ মহাবিদ্যা' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। দশ মহাবিদ্যা ভারতের দশটি অবস্থা।" অক্ষয়চন্দ্রের এই 'দশ মহাবিদ্যা'র নিকট কমলাকান্তের 'দুর্গোৎসব' ভাবের হিসাবে ঋণী কি না কে বলিবে? অক্ষয়চন্দ্র প্রথম যৌবনে 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক যে এক সুদীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে আছে—

"সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র হিন্দুস্থানভূমি,
অবিস্মৃত অগণিত বীরপ্রসূ তুমি!
স্বাধীনতা-বেদী ছিলে সুখ-পীঠ স্থান,
গৌরব-কবর এবে অসুখ আধান:
আর্য্যলোক-বাস বলি আর্য্যাবর্ত্ত নাম,
তব গরিমার বুঝি এই পরিণাম!"

ইহা ছাড়া তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী'ও এই সময়ে সরল ভাষায় রাজনীতি ও প্রজানীতির আলোচনা আরম্ভ করে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের রাজ্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ'ই অবশ্য এ

বিষয়ের অগ্রদূত। তবে 'সাধারণী'ই সর্ব্বপ্রথম এ জিনিষটাকে পাঠক-সাধারণের মুখরোচক করিয়া তুলে।

এই সময়ে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'আর্য্যদর্শন' নামক মাসিক পত্রদ্বয়ের উপরও 'বঙ্গদর্শনে'র বিলক্ষণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এই দুইখানি কাগজই 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের এক বৎসর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুর' হইতে একটি কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"কোথা আছে হেন দেশ বঙ্গের সমান!
কোথা পদ্মা ভাগীরথী,
বুড়ী-গঙ্গা স্রোতস্বতী,
কলকল স্বরে করে প্রকৃতির গান!
কোথা রে এমন দেশ ত্রিদিব-সমান।

* * *

প্রকৃতির কর-চিহ্ন বিলে আর ঝিলে,
দিবাভাগে কমলিনী,
নিশিযোগে কুমুদিনী
কোথা ফোটে? কোথা ডাকে বসন্তে কোকিলে?
কোথা রে মরাল ভাসে বিমল সলিলে?

* * *

নিদাঘে বহে রে কোথা মলয় পবন?
বাতায়ন দ্বার খুলে,
নিদ্রা যাই ক্লেশ ভুলে।
এমন মধুর কোথা গ্রীষ্মে সমীরণ?
কোথা রে শীতলে প্রাণ মলয় পবন?

* * *

শরতে শারদ-শশী উদয় কোথায়?
সে শশীরে হৃদে ধরে'
কোথা মৃদু কলস্বরে,
নাচিতে নাচিতে নদী সাগরে মিশায়?
নদী-জলে শশী ভাসে এমন কোথায়?

* * *

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা বল কোন্ দেশে,
মায়াময়ী মহামায়া,
ধরিয়া মাটির কায়া
বিরাজিত কোন্ দেশে বল হেন বেশে?
কোথা নিরানন্দ হেন নবমীর শেষে?

* * *

কোন্ দেশে আছে হেন রমণী-রতন?
বঙ্গকুলবালা-সম,
রূপে গুণে অনুপম,
দেখিয়াছ কোন্ দেশে রমণী এমন?
বঙ্গ-সরে সরোজিনী বঙ্গ-নারীগণ।

* * *

তাই এত ভালবাসি হে বঙ্গ তোমারে ;
বাঙ্গালী বলিয়া তাই
পরিচয়ে সুখ পাই,
যে তোমারে ভালবাসে, ভালবাসি তারে,
ঘৃণি গো তাহারে সতি, যে ঘৃণে তোমারে।"

এরূপ সরল সুমিষ্ট ভাষায় বঙ্গ-বন্দনা তখনকার দিনের আর কোনও কাগজে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

যাহা হউক, একটি কার্য্যের জন্য 'আর্য্যদর্শনে'র সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম এক্ষেত্রে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তিনিই বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম স্বদেশের ও বিদেশের স্বদেশ-ভক্তগণের জীবন-কথা লিখিয়া স্বজাতির মনে জাতীয় ভাব ও স্বদেশ-ভক্তি জাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিলাতী রাজনৈতিক ভাব বাঙ্গালায় আমদানী করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক নূতন বাঙ্গালা শব্দ সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। যে ভাব-প্রণোদিত হইয়া তিনি বিদেশী দেশভক্তগণের জীবন-কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে ভাব দেশভক্তিরই নামান্তর। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্মবলি-প্রদান সর্ব্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে

শিখিবেন, তখন দেবী-প্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আপনিই উন্মুক্ত হইবে। ইতালীবাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বিশ্বাসশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকালব্যাপিনী অধীনতায় তাঁহারাও জাতীয় অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামীতে বিশেষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহারাও স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্য পদে পদে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাঁহারা নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু সেই ইতালীই আবার ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায় জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিল, তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল অনায়াসেই ইতালীয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যে যে প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাত্মগণের নিরন্তর যত্নে ও আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্ব-প্রপীড়িত জাতিসকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্ম-বিসর্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি প্রধান ব্রত। সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্ম-স্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান করিতে শিখেন, যদি সেই সকল জীবনের মোহিনী শক্তি-বলে দুই জন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন—তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।"

যদিও ইহার অনেক পূর্ব্বে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' নামক মাসিকপত্র দুইখানিতে কয়েকটি স্বদেশ-প্রেমিকের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সব জীবন-কথায় স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিবাৎসল্যের বিশেষ অনুভূতির পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে। সেইজন্য যোগেন্দ্রনাথেরই নাম এক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য মনে করি।

তারপর নাম করিতে হইলে, রজনীকান্ত গুপ্তের নাম করিতে হয়। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'ভারতকাহিনী', 'বীর-মহিমা' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' পড়িয়া রামেন্দ্র বাবু বলিয়াছিলেন,—"সত্যের প্রতি অনুরাগ,

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিতে পাইলাম।"

এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আরও এমন দুইজন শক্তি-শালী লেখক দেখা দিয়াছিলেন, যাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতিমূলক রচনার কথা এখানে না বলিলে অন্যায় হইবে মনে করি। প্রথম—রমেশচন্দ্র দত্ত। এবং দ্বিতীয়—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশেরও পূর্ব্বে, লণ্ডনে অবস্থান-কালে—১২৭৭ সালে (এই সময়ে হেমচন্দ্রের "ভারত-বিলাপ" ও "ভারত-সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়) "Lines on India" নামে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার কথা পাঠকসাধারণ না জানিতে পারেন, কিন্তু পরে বঙ্কিমের প্ররোচনায় বাঙ্গালা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি "জীবনপ্রভাত" ও "জীবনসন্ধ্যা" নামে যে দুইখানি স্বদেশ-প্রীতিমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহার কথা উপেক্ষার যোগ্য নহে। প্রথম যৌবনে ভারত-উদ্দেশে তিনি ইংরেজী ভাষায় গান ধরেন—

"Is this the land of ancient pride
Where Freedom lived, where heroes bled ?
Ask of these regions vast and wide
From billowy sea to mountains dread !
Hark, every spot on India wide
Doth tell a tale of ancient pride !

*   *   *   *

Hark, every pass and every hill
Recalls the days of liberty !
Hark, how from every peak and rill,
From echoing vales, from wood and lea,
Awakes one voice of maddening glee,
The thrilling voice of liberty !"

ভারতবর্ষের এই মহিমা-গীতি ইংরেজ কবির 'Rule Britannia' র ন্যায় স্বদেশ-প্রীতির উচ্ছ্বাস বটে, কিন্তু এই উভয় উচ্ছ্বাস একই উদ্দেশ্যে, ঠিক একই অনুভূতি হইতে

উৎপন্ন নহে। একটি নিদ্রিত জাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য লিখিত। অন্যটি জাগ্রত জাতিকে জাগাইয়া রাখিবার গান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' একবার বলিয়াছিলেন,—"যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে।"—ভারতবাসী পূর্ব্ব মাহাত্ম্য হারাইয়াছে, কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক স্মৃতি আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কবি রঙ্গলালই প্রথম এদেশে ঐতিহাসিক স্মৃতি-সাহায্যে দেশীয় ভাষায় দেশবাসীকে তাহার পূর্ব্ব মাহাত্ম্য শুনাইতে অগ্রসর হন। তারপর হেম, বঙ্কিম, নবীন প্রভৃতির লেখনী-গুণে ঐ ভাব-প্রবাহ শত সহস্র গুণে ফুলিয়া ফাঁপিয়া গর্জ্জিয়া উঠে। রমেশচন্দ্রও পরে এই ভাব-প্রণোদিত হইয়া ভারতের ঐতিহাসিক স্মৃতি-ভান্ডার হইতে দুইটি স্বদেশ-প্রেমিক মহা-পুরুষের—ছত্রপতি শিবাজী ও রাণা প্রতাপের জীবন-কথা লইয়া 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' নামে দুইখানি দেশাত্মবোধপূর্ণ উপন্যাস প্রণয়ন করেন।

এইবার ঈশানচন্দ্রের কথা বলিব। ঈশানচন্দ্র কবিবর হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর। অগ্রজের ন্যায় তিনিও জাতি-বৈর-জনিত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'কি লিখিব—আজ,' 'স্বভাবে কি অর্থ নাই,' 'এক অত্যাচারী ইংরাজের প্রতি' প্রভৃতি স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা লিখিয়াছিলেন। 'রাণা প্রতাপসিংহ যখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আকবরের কাছে সন্ধি-পত্র প্রেরণ করেন, তখন পৃথ্বীরাজের রাজপুত বন্ধুবর্গ তদুপলক্ষে তাঁহাকে একটি আক্ষেপপূর্ণ কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহাদের কিরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই কল্পনা করিয়া ঈশানচন্দ্র 'কি লিখিব—আজ' নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন! এরূপ শোকপূর্ণ কবিতা বঙ্গসাহিত্যে বিরল বলিয়া এস্থানে কিয়দংশ তাহার উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"লিখ লিখ" বল, কোথায় লিখিব!
এ তীব্র যাতনা কোথায় ঢালিব!
লিখিতাম,—যদি মাত আর্য্যভূমি,
সে অক্ষর বুকে ধরিতে মা তুমি!
লিখিতাম,—যদি আর্য্যের সন্তান,
তোমাদের প্রাণে দিতে তার স্থান!

রে নির্ম্মম কাল! তোমার হৃদয়,
পেতেম বারেক লিখিতাম তায়!
আর লিখিতাম—অরাতি তোমার
বুকে যদি রেখা পড়িত লেখার!
নহে লিখিবার—নহে বলিবার!
নহে ঢাকিবার—নহে সহিবার!
যে কাব্য লিখিতে আজ এই প্রাণ,
ছোটে আর্য্যাবর্ত্তে খুঁজে উপাদান,
হংস-পুচ্ছে তাহা নাহি যায় লেখা,
এ মসীতে তার ফুটে না রে রেখা,
জীবন্ত সে কাব্য—জ্বলন্ত সে ভাষা,
প্রতি অঙ্কে তার বিকট পিপাসা;
লেখনী তাহার উলঙ্গিনী অসি
অরাতি-রুধির শুধু তার মসী।

*　　　*　　　*

অস্থির লেখনী—উন্মত্ত কল্পনা,
আকুল অন্তরে দুর্দ্দম বাসনা;
পারি লিখিবারে খুলিয়া হৃদয়,
যদি আর্য্যে তার কর অভিনয়!

রঙ্গভূমি তার কর দরশন,
যবনিকা ওই করি উত্তোলন—
দাঁড়ায়ে প্রতাপ একা নিঃসহায়
সে কাব্য পড়িতে যদি সাধ যায়,
হও অগ্রসর দলে দলে দলে—
লিখি মহাকাব্য মহা কুতূহলে।

এইবার এইখানে একজন পরিব্রাজকের কথা আমরা বলিব। পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দের (কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) কথা বড় একটা কাহাকেও বলিতে শুনি না বটে, কিন্তু বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-যুগে তিনি বক্তা-রূপে প্রকট হইয়া তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ বাগ্-বিভূতির গুণে দেশের অনেকের মতিগতি যে অনেকটা ফিরাইয়াছিলেন এবং অনেকের মনে ভারতীয়

গৌরব-বুদ্ধি যে কতকটা জাগাইয়াছিলেন, এ কথা ভুলিবার নহে। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতাই জাতীয় সাহিত্যের সম্পদ্‌-রূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। ১২৮২ সালে তাঁহার একটি বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলেন,—"যে ভারতের উত্তরভাগে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া, হৃদয়ে অমূল্য রত্নমালা ধারণ করিয়া, নির্ম্মল নীরপ্রবাহ নদ-নদী নিঃসারিত করিয়া, হিমাচল অটলভাবে দণ্ডায়মান ; যে ভারতের পূর্ব্ব-পশ্চিমে মহারোল-কল্লোল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-মালায় আস্ফালনপূর্ব্বক পার্ষদরূপে উপসাগরদ্বয় বিরাজমান ; রত্নাকর মহাসাগর যে ভারতের নামে স্বয়ং নাম ধারণ করিয়াছে, ও দক্ষিণভাগে উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে যে ভারতের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে, স্বাভাবিক শৃঙ্গমালা যে ভারতকে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত লোক-চিত্ত-বিনোদ-বিহার-ভূমি করিয়া রাখিয়াছে ; শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা যে ভারতের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়াছে, শক্তি- ও সামর্থ্য-বলে যে ভারত জগদ্‌গুরু বলিয়া ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে ; আজ সেই ভারতবাসী আপনার তত্ত্ব ভুলিয়া, আপনার দেশ, আপনার জাতীয়তা, আপনার কুল মান মর্য্যাদাকে তাচ্ছিল্য করিয়া, আপনার শিক্ষা ও দীক্ষা, আপনার অভ্যুদয় ও মহত্ত্ব, আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য, আপনার অতুল বলবীর্য্য, আপনার স্বর্গীয় ধৈর্য্য ও শৌর্য্য, আপনার তপোবীর্য্য-সম্ভূত জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হইয়া, পরের কথায় আপনাকে কাঙ্গাল, পরের কথায় আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবীর্য্য জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে অমানুষ বোধ করিয়া, পরের কথায় আপনাকে অসভ্য ও অশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া, পরের কথায় আপনাকে ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, বনের পশু অপেক্ষাও জ্ঞানহীন বিশ্বাস করিয়া, নিজ-উন্নতির জন্য সমুদ্র-পারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে! আপনাকে না জানিয়া হতভাগ্য ভারত আজ দুঃখের পরাকাষ্ঠার পদসেবা করিতেছে!"

এইরূপ দেশবাসীকে মহত্ত্ব-লাভে উত্তেজিত করিবার জন্য তাহার অতীত মহত্ত্বের কথা তিনি তাঁহার নানা বক্তৃতায় নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাহুল্য-ভয়ে আমরা আর উদ্ধৃত করিলাম না। আসল কথা, যে সময়ে আমরা বিলাতী সভ্যতার সহিত ভারতবর্ষীয় সভ্যতার তুলনা করিয়া ভারতকে ধিক্কার ও ইউরোপকে বাহবা

দিতেছিলাম, সেই সময়ে তাঁহার বক্তৃতাসমূহ এই আত্মবিস্মৃত জাতির পক্ষে অনেকটা ফলপ্রদ ঔষধরূপে কার্য্য করিয়াছিল।

নাট্য-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

এই যুগে এই ভাব-প্রভাব হইতে বঙ্গ রঙ্গালয়ও মুক্তি পায় নাই। 'নীলদর্পণে'র অভিনয়ের পর ১২৮০ সালে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতমাতা" নামে একটি ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থ কলিকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। অমৃতলাল লিখিয়াছেন,—"ভারতমাতার অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চে জননী জন্মভূমির প্রথম পূজা।" শুনিতে পাই, এই ক্ষুদ্র নাটিকার যে দৃশ্যে চিন্তামগ্না আলুলায়িত-কেশা ভারত-মাতার সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, এবং ভারত-লক্ষ্মী আসিয়া গান ধরিতেন, সে দৃশ্যে দর্শকেরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। 'ভারতমাতা' পুস্তক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তাহা হইতে একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"দেখ গো ভারত-মাতা তোমারি সন্তান,
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হত-জ্ঞান।
সবে বল-বীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।
মরি এ দশা তোমার, সহিতে না পারি আর,
অপার জলধি-পার চলিলাম ছাড়ি স্থান।।"

বলিতে কি, সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই স্বদেশপ্রাণতা তখনকার দিনে কতকটা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গুপ্ত-কবির অন্যতম শিষ্য মনোমোহন বসু মহাশয় 'হরিশ্চন্দ্র' সম্বন্ধে নাটক লিখিতে গিয়াও সে ভাব-প্রবাহকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। 'নীলদর্পণ' ও 'ভারতমাতা'র পর উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' প্রভৃতি স্বদেশ-প্রীতিমূলক নাটক যখন অভিনীত

হইতেছিল, তখন মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' নামক পৌরাণিক নাটক আমাদিগকে এই গান শুনাইয়াছিল—

"দিনের দিন, সবে দীন হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তনু ক্ষীণ।।

* * *

ছুঁই সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশালাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম করাও কর্ত্তব্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম,' 'অশ্রুমতী,' 'সরোজিনী,' 'স্বপ্নময়ী' প্রভৃতি নাটকগুলির মধ্যে জাতি-বৈর-জনিত স্বদেশপ্রেম প্রবল। তাঁহার 'পুরুবিক্রম' নাটকে পুরু বলিতেছেন,—

"স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে শত ধিক্ তারে,
পচুক্ সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা-বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ ল'য়ে,
যে ধরে এমন প্রাণ, ধিক্ বলি তারে।।

যায় যাক্, প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্,
বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।

এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ় পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর-পাতন কিম্বা বিজয়-সাধন।"

সুরেন্দ্রনাথের 'হামির' নামক নাটকও এই শ্রেণীভুক্ত। 'হামির' নাটকে ভাটের মুখে যে সকল গান আছে, সেগুলির আগাগোড়া উদ্দীপনাপূর্ণ। ভাটের একটি গান এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।—

"ভাঙ্গিল স্বপন, পরাধীন জন,
এবে অধীনতা-দুখরাশি।
দেশ-অনুরাগে, বীর ধীর জাগে
জাগে জন্মভূমি-সুখ-প্রয়াসী।
পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
পদ্মিনী-কাহিনী হে চিতোরবাসি।
তপন-আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর-শোণিত-স্রোত বৈরি-বিনাশি।
ধীর বীর জাগো, বিদায় মাগো,
কার্য্যকাল হ'লো উদয় আসি।"

এই নাটকখানি ১২৮৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং একটি রঙ্গালয়ে ইহার অভিনয়ও হইয়াছিল। ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে, পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন "ভারতের সুখ-শশী যবন-কবলে" নাম দিয়া একখানি স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহার অভিনয় কখনও হয় নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই অভিনয়ে জমিয়াছিল। তাঁহার একখানি নাটক হইতে দেশ-মাতার একটি স্তুতিপূর্ণ গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
কার স্তনে বহিতেছে জাহ্নবীর ধারা?
ধন ধান্য রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ?
কে তিনি আমার মাতা?—তিনি জন্মভূমি।
হাঁ, সেই জননী মম মোর জন্মভূমি।
সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের।

দ্যাখো দ্যাখো আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যার কমলার বাস,
দক্ষিণ কমলকরে দেবী বীণাপাণি,
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃঙ্খল।"

এ স্থলে নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশবাসীর অবসাদগ্রস্ত জাতীয় জীবনে উৎসাহের সঞ্চার-উদ্দেশ্যে এই যুগে তিনি 'ভারত-সান্ত্বনা' নামে একখানি 'দৃশ্য-রূপক' রচনা করেন। ইহাতে ব্রহ্মা ও ভারত-মাতার যে কথোপকথন আছে, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা পড়িলে পাঠকগণ এই পুস্তিকার মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

ব্রহ্মা।—(ভারত-মাতার প্রতি)

তোমার মঙ্গল তরে, ঐক্য আর সাহসেরে
পাঠাইনু পুনরায় আবাসে তোমার ;
ব'ল তব পুত্রগণে, প্রাণপণে সযতনে
পালে যেন উপদেশ সেই দু'জনার।

ভারত-মাতা।—(প্রণাম করিয়া)

হে পিতঃ জগত-স্বামি! অবশ্য বলিব আমি
আমার তনয়গণে যত্ন-সহকারে,
ঐক্য আর সাহসেরে, দৃঢ়তম পণ ক'রে
হৃদয়ের অন্তস্তলে অবলম্বিবারে।

ব্রহ্মা।—

যদি তা'রা অবলম্বে সেই দেবদ্বয়ে,
পুনঃ 'স্বাধীনতা' তব উদিবে হৃদয়ে।

ভারত-মাতা।—

ভাল কথা হ'ল মনে, দেখি নাই দু'নয়নে
বহুদিন স্বাধীনতা-দেবীর চরণ ;
যদি দয়া করি পিতঃ জুড়াও তাপিত চিত
সেই মহা ঈশ্বরীরে করি প্রদর্শন।

ব্রহ্মা।—

এখানে পা'বে না তুমি দেখিতে তাঁহায় ;
ঐক্য সাহসেরে ব'ল—দেখা'বে তোমায়।
এখানে সে দেবী নাই—না আসে ডাকিলে,
তব দুঃখে শূন্যে ভাসে নয়ন-সলিলে!

এই ক্ষুদ্র দৃশ্য-রূপক ছাড়া, রাজকৃষ্ণ রায়ের আরও এমন অনেক স্বদেশপ্রেমমূলক গান ও কবিতা আছে, যাহা উপেক্ষার যোগ্য নহে। ১২৮৩ সালে তাঁহার 'ভারত-ভাগ্য,' 'ভারত-বিলাপ-গীতিকা' ও 'স্বদেশপ্রিয়ের শেষ দেখা' শীর্ষক কবিতাগুলি এবং ১৮৮৫ সালে 'ভারত-গান' নামক গানের বহি প্রকাশিত হয়। এক শত দেশাত্ম-বোধপূর্ণ সঙ্গীতে 'ভারত-গান' সম্পূর্ণ। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই মর্ম্মস্পর্শী। এই গ্রন্থের কোনও এক গানে কবি দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেশ-মাতাকে বলিতেছেন,—

"নিশিদিন রে দুখিনি! এ কি তোর হ'ল হায়!
কঠিন শিকল গলে, বহিবি নিগড় পায়!
কোথা তোর অলঙ্কার, কেন বুকে শিলা-ভার
কেন ছিন্নবাস পরা, কেন ধূলি মাখা গায়?"

আবার কোনও গানে দেশের দুর্দ্দশা-জন্য দেশবাসীকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"আমাদেরি দোষে ভাই! আমাদের জন্মভূমি,
স্বর্গ-ভ্রষ্ট হ'য়ে, হায়, হয়েছে শ্মশান-ভূমি।"

আবার কখনও বা দেশবাসীকে আশা-উৎসাহে উদ্দীপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে উপদেশ দিয়াছেন,—

"দুর্ঘট কিছুই নয়, স্থাপন করহ ঘট ;
সম্মুখে রাখহ তার শক্তির বিশাল-পট।
বক্ষ চিরি' দশ নখে ডুবাও অম্লান মুখে
শোণিতে রকত-জবা, ভকত-পূজন রট।

আলস্য-অনৈক্য-মেষ বলি দিয়া কর শেষ,
চিত-হোমকুণ্ডে ঢাল উৎসাহ-হবি;
যতনে করিয়া ভর, মঙ্গল আরতি কর,
জাগাও শক্তিরে পুনঃ ঘুচিবে সব সংকট।"

শক্তিকে জাগাইতে পারিলে দেশের সব সংকট যে দূরে যায়, এ কথা কবি তাঁহার বহু গান ও কবিতাতেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তবে এই সকল রচনায় উদ্দীপনার চেয়ে করুণ সুরেরই প্রাধান্য যেন বেশী মনে হয়।

পূর্ব্ববঙ্গে দেশাত্মবোধের গান

এই বঙ্কিম-যুগে পূর্ব্ববঙ্গও নীরব ছিল না। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে প্রায় তিন বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং বলিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেই কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সুর ধরিয়াছিলেন,—

"কোটি-কল্প নরকের বাস ইচ্ছা হয়,
পলকের অধীনতা তবু প্রিয় নয়।"

তাঁহার 'জন্মভূমি' শীর্ষক কবিতাও শ্রবণযোগ্য। তাহাতে আছে,—

"ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
'স্বর্গ' 'স্বর্গ' করে লোক সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য্য-বিহীন,
থাক্ তার চারি পাশে বিজন বিপিন।
না থাক্ নিকটে—নদ-নদী-সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর,
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার!
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।"

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—এই প্রাচীন ভক্তি-সূত্রেরই ইহা ভাষ্য। দেশ সুন্দর বলিয়া কবি কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশকে ভালবাসেন নাই ; দেশ 'জন্মভূমি' বলিয়াই তিনি দেশকে 'সুখের স্বর্গ' মনে করিতেন। তবে কবির এ জন্মভূমির লক্ষ্য বঙ্গ বা ভারতবর্ষ যে নহে, ইহাও এখানে মনে রাখা দরকার।

এই যুগেই কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কণ্ঠ হইতে করুণ ক্রন্দনের এই সুর উঠিয়াছিল,—

"কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারে পার হবে।
অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হ'লে, পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে, ধন-রত্ন সুখে, বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন আনন রে, পর-পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চনভাজন সৌধ-শিরে হ'ল ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাত খুঁড়ে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে পুঁজিপাত নিলে জুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, করপণ্যে দিলে, পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গসুখে তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে, ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদী হলে, পরমাদ রটে, পরমাদ হলে হিতবোধ ঘটে।
কি ছিলে, কি হলে, কি হ'তে চলিলে, অবিবেক-বশে
কিছু না বুঝিলে।" ইত্যাদি

এ সঙ্গীত এক কালে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। এই কবির 'যমুনা-লহরী'র করুণ কল্লোলও তখনকার বাঙ্গালীর কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াছিল।

'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্রও এ সময়ে একেবারে নীরব ছিলেন না। তাঁহার "সুশিক্ষিতদিগকে উত্তেজনা" ও "পিতার নিকট বীরের বিদায়-গ্রহণ" শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে তেমন কবিত্ব না

থাকিলেও দেশহিতৈষণা দিব্যরূপেই দীপ্যমান। "সুশিক্ষিতদিগকে উত্তেজনা" কবিতার একস্থানে আছে,—

"তোমাদের জন্মভূমি স্নেহের আধার
আহা! তার দশা চেয়ে দেখ একবার।
পুত্রহীনা মাতা-মত, করি শির অবনত,
অবিরত ফেলিতেছে অশ্রুবারি-ধার।
নিবারিতে তার নয়নের জল—
নিবারিতে তার হৃদয়-অনল,
কত যত্ন কত করিলে কৌশল,
বল দেখি? নিবারিতে মাতৃ-দুঃখচয়
উপযুক্ত পুত্রদের উচিত কি নয়?"

তাঁহার দ্বিতীয় কবিতার শেষ কয় ছত্র এইরূপঃ—

"অয়ে তাত! মানব-জীবন,
নহে কিছু চিরস্থায়ী, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই,
অবশ্য একদা গ্রাস করিবে শমন,
দেশের—দেশীয়দের হিতে হেন প্রাণ
দিব, কি সৌভাগ্য যার ইহার সমান।"

তারপর আনন্দচন্দ্র মিত্র আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন,—

"যে দেশে জনম মোর, বাস যেই দেশে,
যে দেশের বায়ু বহে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে,
যে দেশের রবি তাপ বিতরে আমায়,
যে দেশের স্রোতস্বতী সলিল যোগায়,
যার ফল-শস্যে করি জীবন ধারণ,
যার বক্ষে সদা সুখে করি বিচরণ,
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান?
সেই মম জন্মভূমি জননী-সমান।
যে দেশের গিরি-নদী কত শোভা ধরে,
খনি-মধ্যে জ্বলে মণি, মুক্তা সাগরে,

অতুল নক্ষত্র-শোভা সুনীল আকাশে,
নব জলধর-সহ সৌদামিনী হাসে,
যে দেশে কাননে শোভে কত শত ফুল,
কলকণ্ঠে গায় গীত বিহঙ্গমকুল,
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান?
সেই মম জন্মভূমি স্বর্গের সমান।

*	*	*

যার অন্ন-জল খেয়ে শরীর জীবিত,
যার নামে ধরাতলে হই পরিচিত,
যাহার গৌরবে কত সুখের উদয়,
যাহার পতনে হয় পতন নিশ্চয়,
দূর দেশে থাকি যারে করিলে স্মরণ,
উথলে হৃদয়, আর ঝরে দু-নয়ন,
তার তরে শরীরের রক্ত-বিন্দু দান
যে না করে, কৃতঘ্ন সে পশুর সমান।"

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব নবীনচন্দ্রের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অন্যান্য কবি ও লেখকের কথা যথা সময়ে বলিব। এইবার কংগ্রেসের সহিত বঙ্গসাহিত্যের সম্বন্ধ কেমন ভাবে কতটুকু স্থাপিত হইয়াছিল, সেই কথা বলিবার চেষ্টা করিব।

কংগ্রেস-যুগ

হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ' ও 'ভারত-সঙ্গীত' ১২৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ঈশানচন্দ্রের 'কি লিখিব আজ', 'স্বভাবে কি অর্থ নাই' প্রভৃতি কবিতা ১২৯২ সালে 'চিন্তা' কাব্যে মুদ্রিত হয়। এই ১২৭৭ সাল হইতে ১২৯২।৯৩ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে পরাধীনতার বেদনা-বোধ-জনিত দেশপ্রীতির প্রবাহ সতেজে সমানভাবে বহিয়াছিল। এই ভাব-প্রবাহের ফলে কংগ্রেসের যে সৃষ্টি হইয়াছিল,

অবশ্য এমন কথা বলি না। এমন কি, যে ভাব-প্রেরণায় এই নবীন সাহিত্যের সৃষ্টি, ঠিক সেই ভাব-প্রেরণা যে কংগ্রেস-সৃষ্টির মূলে ছিল, সে কথাও বলা যায় না। কংগ্রেসোৎপত্তির কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে যে ভারত-সভার বা Indian Association -এর জন্ম হয়, তাহাকে বরং কংগ্রেসের পূর্ব্ব-রূপ বলা যাইতে পারে। এই ভারত-সভার চেষ্টায় অনুষ্ঠিত National Conference -এর অধিবেশনের সমকালেই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। পরে কংগ্রেস ইহাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। কংগ্রেসোৎপত্তির ইতিহাস স্বতন্ত্র। তবে এ প্রসঙ্গে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যে স্বাদেশিকতার এই বিকাশ ও বিস্তার সংঘটনের সময়ে—অর্থাৎ, ১২৯২ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয়, এবং কংগ্রেস-কর্ত্তারা সাহিত্যের তেমন কোনও ধার না ধারিলেও বাঙ্গালার সাহিত্যিকেরা কিন্তু কংগ্রেসকে সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল তখন অস্তমিত, রাজনীতিক গগনে নবোদিত অরুণের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথ তখন সমুদীয়মান। নরেন্দ্র সেনের 'ইন্ডিয়ান মিরার' ও শিশির ঘোষের 'অমৃতবাজার' স্বদেশপ্রেমের নবানুরাগে তখন গরম গরম রাজনীতিক আলোচনায় নিয়োজিত। সেই সময়ে সাহিত্যাকাশে তরুণ রবি ধীরে ধীরে সমুদিত হইতেছিলেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হয়। সেই অধিবেশন-উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গান লিখিলেন,—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে!
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধ'রে রাখে?

যেথায় থাকি যে যেখানে,—
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে,
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?

মান-অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে,
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।

* * *

কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে।"

হেমচন্দ্রও এ সময়ে নীরব থাকিতে পারেন নাই। কংগ্রেস-সৃষ্টির প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে তিনি "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, আর এই কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে আনন্দ-বিহ্বল হইয়া 'রাখি-বন্ধন' নামে এক আবেগময়ী কবিতা রচনা করেন। এই কবিতা-মধ্যে 'বন্দে মাতরম্' গানের কিয়দংশ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া উৎসাহ-ভরে তিনি বলেন,—

"কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে
ভারত-জননী জাগিল!

* * *

যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর—
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চশরীর,
কার না নয়ন তিতে রে?
সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলে রে।
জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ রাখি-বন্ধন ভারত-মাঝার,
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির-মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।"

তারপর ইহার চতুর্থ অধিবেশন-উপলক্ষে ‘প্রচার’ পত্রে যে কবিতা প্রকাশিত হয়, তাহাতেও ঐ আনন্দোচ্ছ্বাস পরিস্ফুট। তাহার নমুন এখানে একটু দিলাম।

“এখনো কে আছ অবসন্নপ্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্ত্যভূমে আজি কি অমর গান,
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায় ;
দেখহ চাহিয়া কিবা অনুরাগে,
কি সিদ্ধি লভিতে, কোন্ মহাযাগে,
শত শত প্রাণী মিলিয়া প্রয়াগে
প্রমত্ত আজি এ মহাপূজায়!
অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি' লয়
এস সবে গাহি জননীর জয়,
জীবনে না রবে মরণের ভয়,
অসার সংসার ভাবনা ছার—
মহাযজ্ঞ মাতৃ-ক্লেশ-বিমোচন,
মাতৃপূজা কোটি কোটি দেবার্চ্চন,
ইহ-পর-লোকে কি আছে তেমন
বাঞ্ছিত নরের বল না আর?

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জাতীয় মিলন-সঙ্গীতের সূচনা করেন; তারপর কংগ্রেসের সময় হইতে কাগজে কাগজে উহার ছড়াছড়ি দেখা যায়। তবে এ প্রসঙ্গে এটুকু বলাও দরকার যে, এই মিলন-গান এবং কংগ্রেসের এই গুণ-কীর্ত্তন ছাড়া—উহার দোষ-কীর্ত্তন করাও তখনকার দুই একখানা বাঙ্গালা কাগজের প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু, অধিকাংশ সাহিত্যসেবীই কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র এই কংগ্রেস-কুৎসাকারীদিগের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিয়া এই সময়ে ‘মালঞ্চ’ নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

“এলাহাবাদ-কংগ্রেসের সম্পাদক মদনমোহন মালবীর কাছে অপরিচিত-ভাবে গিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তাঁহার দোষের আলোচনা

করি। অথচ আসিবার সময় উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের আবেগে যেন উন্মত্ত হইয়া চির-পরিচিতের মত 'গলাগলি' করিয়া আসি। দোষ-প্রদর্শন এক, বিদ্বেষ আর।"

"কোনও একটি কার্য্যের সমালোচনা করিতে হইলে, কার্য্যটিই দেখা কি উচিত নহে? হয়ত ইহাতে কেহ নামের জন্যে, কেহ স্বার্থের জন্যে, কেহ কেবল গোলে হরিবোল দেওয়ার জন্যে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু যদি কার্য্যটি ভাল হয়, আমি তাহাতেই যথেষ্ট প্রীত হই। মানুষ অপূর্ণ, তাহার কার্য্যও অপূর্ণ। অতএব মানুষের চরিত্রে ও কার্য্যে দোষ ত থাকিবারই কথা। মহামতি Cobden বহু বর্ষব্যাপী Corn Law আন্দোলনের পর বলিয়াছিলেন,—"We have so long been talking rubbish." আমি এই কংগ্রেসের মধ্যে ভগবানের হস্ত দেখি। ইহার আদর্শ সেই রাজসূয় যজ্ঞ। তাহার পর আর এরূপ যজ্ঞ ভারতে সংঘটিত হয় নাই। যেই কৃষ্ণ-নীতির ফল রাজসূয়, সেই কৃষ্ণ-নীতি ইংরাজ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া আজ তাহার ফল—এই জাতীয় কংগ্রেস। * * * যখন ভগবানের রাজসূয়ে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তখন এ মানবের রাজসূয়ে ঘটিবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? ইহাতে যে দোষ ও অভাব আছে, তাহা সহৃদয়তার সহিত, ধীরভাবে, বিনীতভাবে দেখাইয়া দেওয়া অতি মহৎ কার্য্য। বিনীত ভাবে, কারণ আমার মত কি ভ্রান্ত হইতে পারে না?"

এই বর্ষে বঙ্কিম-পরিচালিত 'প্রচার'ও লিখিয়াছিল,—"এই অসময়ে রসময় খাঁ সাহেবেরা কংগ্রেস লইয়া রঙ্গরস বাধাইতেছেন। ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেসের দোষোদ্ঘোষণ-উপলক্ষে শ্বেত, কৃষ্ণ, হরিৎ, কপিশ প্রভৃতি নানা বর্ণের দাড়ি একত্র হইয়া বহুধা আন্দোলিত ও নিষ্ঠীবন-কণানিচয়ে ভূষিত হইয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন অচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন শ্মশ্রুরাজির গতি, প্রক্রিয়া, বেগ, আবেগ, সম্বেগ ও উদ্বেগ-সন্দর্শনে ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মুসলমান কংগ্রেসে আসিতে চাহে না। * * * সৌভাগ্য-ক্রমে সকল মুসলমান এইরূপ দূরবস্থাপন্ন নহেন। যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধির ধার ধারেন, তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষে। এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাদিগের কোন দোষ নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালকে কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি; সেগুলির কল টিপিলেই দাড়ি

নাড়ে। শুনিতেছি, পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে নাকি কল টিপিতেছে, তাই ইঁহারা দাড়ি নাড়িতেছেন। কলের পুতুল কলে দাড়ি নাড়িবে, তাহাতে আর আপত্তি কি?* * * রসের কথা এই যে, গোটা কতক হিন্দুর টীকি মুসলমানের দাড়ির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। * * কলে শুধু দাড়ি নয়, টীকিও নড়ে।”

কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য তখনকার দিনে শুধু বাঙ্গালা কাগজ নয়,—বাঙ্গালার রঙ্গালয়ও অগ্রসর হইয়াছিল। কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতায় হয়। সেই অধিবেশন-উপলক্ষে মহাকবি গিরিশচন্দ্র “মহাপূজা” নামে একখানি ক্ষুদ্র রূপক রচনা করেন। ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ ষ্টার থিয়েটারে উহার অভিনয় হয়। শুনিতে পাই, ইহার অভিনয়-দর্শনে প্রীত হইয়া দান-বীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে পুরস্কার-স্বরূপ পাঁচ শত টাকা প্রদান করেন। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং উহা গ্রহণ না করিয়া অভিনেতৃবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে বলেন। এই রূপকখানিতে আছে, একজন ভারত-সন্তান বলিতেছে,—

“ভারত-সন্তান, কর কোলাকুলি, দুঃখ-নিশা অবসান।
কি হেতু নীরব, এ মহা উৎসবে, প্রাণ খুলে কর গান।।
একতা-রতন, বহুদিন হ'তে, ভারতে ছিল না, ভাই।
কর হে যতন, এ মহা রতনে, পেয়ে যেন না হারাই।।
পঞ্জাব-প্রয়াগ, অযোধ্যা-কনোজ, মহারাষ্ট্র-মাড়োয়ার।
মান্দ্রাজ-বোম্বাই, আসাম-নাগপুর, উৎকল-বঙ্গ-বিহার।।
হিন্দু বা খৃষ্টান, পার্শি-মুসলমান, একপ্রাণ আজি সবে।
একতা-বিহীন ভারত-সন্তান, কেহ আর নাহি ক'বে।।
সদয় ইংলন্ড, নাহি আর ভয়, পূরিবে মনেরি আশ।
হৃদয়ের সাধ রেখ না গোপন, প্রকাশিয়া কহ ভাষ।।”

এই “মহাপূজা”র প্রায় বার বৎসর পরে, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু-রচিত “নবজীবন” নামে মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একখানি একাঙ্ক নাট্যলীলা ষ্টারে পুনরায় অভিনীত হয়। ইহাতে আছে, ভারত-মাতা গাহিতেছেন,—

“জাগো রে জাগো রে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ।
কোথা তোদের বল-বীর্য্য—কোথা সে উন্নত মন।।

তোদেরি পুরাণ-গাথা, সিংহ-পৃষ্ঠে দুর্গা মাতা,
দশভুজে দশ দিক করেন শাসন।
তোমাদেরি ব্যাস কবি, এঁকেছিল বীর ছবি,
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভারতে গঠন।
তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা,
গিরি-বনে ক্ষুণ্ণ মনে করেছিল দিন যাপন।
প্রচণ্ড ইংলণ্ড তোরে দিতেছে নবজীবন।।"

দেশ-ভক্তির সহিত এই যে ইংরেজ-ভক্তি বা রাজ-ভক্তির প্রচার—"সদয় ইংলণ্ড, নাহি আর ভয়, পুরিবে মনেরি আশ।" অথবা "প্রচণ্ড ইংলন্ড তোরে দিতেছে নবজীবন"—ইহা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে বড় বেশী শুনা যাইত না। ইহাও কংগ্রেসের ফল। হিউম্ সাহেব কংগ্রেসের জন্ম-দাতা। তিনি তখনকার বড়লাট লর্ড ডফারিনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কাজেই কংগ্রেসের জন্য জয়-গান করিতে গেলে তখনকার দিনে 'সদয় ইংলণ্ড' বলা কতকটা অনিবার্য্য হইয়া পড়িত। এমন কি, যে হেমচন্দ্রকে অক্ষয়চন্দ্র জাতি-বৈর-জনিত-দেশভক্তির 'প্রধান ঘটক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তিনিও কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন-উপলক্ষে 'রাখি-বন্ধন' নামে যে কবিতা রচনা করেন, তাহার একস্থলে বলিয়াছেন,—

"ধন্য রে বৃটন ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ-যুগান্তের অমানিশি ঘোর—
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন
এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল।"

তবে এ বৃটিশ-ভক্তির ধুয়া ক্রমে কমিতে আরম্ভ করে। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনে যে মিলন-গান রচনা করেন, তাহাতে অবশ্য ঐ ধুয়া ছিল না। পরে ১৩০৩ সালে কলিকাতায় যে-বার কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন হয়, সে-বার তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গকে মিলন-সঙ্গীত না শুনাইয়া দেশ-মাতার এই বন্দনা-গান শুনাইয়াছিলেন,—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণি,
জনক-জননী-জননি!

নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণ-তল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত পুণ্য-কাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন ;
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্যপীযূষস্তন্য-বাহিনী।"

অমরত্বের তরণীতে এ গান স্থান পাইয়াছে। শিক্ষিত সমাজে তখন 'বন্দে মাতরম্' গানের পরই এই গানের আদর হয়। গিরিশচন্দ্রের 'বাসর' নামক গীত-প্রধান নাটকের প্রথম গানটির প্রথমাংশে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের কৌতূহল-চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"জয় জয় ভারত-জননী।
বিহঙ্গ-কূজিত, ষড়্ ঋতু-শোভিত, ধ্বনিত-বেদগীত, ধরিত্রী-মুকুটমণি।
রত্ন-আকর ফেনিলনীল-সাগর-বিধৌত-চরণ,
মলয়াচঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল, বিচিত্র ফুলদল-ভূষণ ;
ক্ষীরধার তব পয়োধর-নিঃসৃত,
পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত,
যুক্ত মুক্তধারে ত্রিবেণী, যজ্ঞসূত্রোপম গঙ্গা সুরধুনী
স্বর্ণশস্যপ্রসূ শ্যামলা, বিন্ধ্যাচলশ্রেণী মেখলা,
কীর্ত্তিমালিনী, ধর্ম্মভালিনী, যজ্ঞ-ধূম-কুন্তলা,
শক্তিদাত্রী, বীরধাত্রী, শুভ্র হিমাদ্রি-কিরীটিনী।"

উপরি-উদ্ধৃত উভয় গানের ভাব ও ভাষা প্রায় এক প্রকার। তবে রবীন্দ্রনাথ দেশ-মাতাকে 'ভুবন-মনোমোহিনী' বলিয়াছেন! গিরিশচন্দ্র 'ধরিত্রী-মুকুটমণি' বলিয়া মাতৃ-আহ্বান করিয়াছেন।

তারপর (১৩০৮ সালে) কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের প্রারম্ভে সরলা দেবীর রচিত যে গানটি গীত হয়, তাহার প্রথমাংশ এইরূপ ;—

"অতীত-গৌরববাহিনি মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'।
মহাসভা--উন্মাদিনি মম বাণি! গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'!
কর বিক্রম-বিভব-যশ-সৌরভ-পূরিত
সেই নাম গান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল,
মান্দ্রাজ, মারাঠা, গুর্জ্জর, নেপাল,
পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে—
'নমো হিন্দুস্থান!'"

কংগ্রেসের জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলন-যুগের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে স্বদেশ-প্রীতির ধারা বহিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় কতকটা নিস্তেজ ও ক্ষীণকায় প্রতীয়মান হইলেও জাতীয় সাহিত্যে সম্পদ্‌-রূপে পরিগণিত হইবার মত সামগ্রী যে সে সময়ে আমরা কিছু পাই নাই, এমন নহে। মনে হয়, মহিলা-কবি কামিনী রায়ের 'মা আমার' নামে সুমিষ্ট কবিতাটিও এই কংগ্রেস-যুগেরই রচনা। কামিনী রায়ের এই হৃদয়োচ্ছ্বাস—

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে,
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার?
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার
মরিব তোমারই তরে ;—মা আমার, মা আমার।
মরিব তোমার কাজে, বাঁচিব তোমার তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।"

এখনও অনেকে সাগ্রহে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ বিবেকানন্দের রচনায় জাতীয় ভাব-উদ্দীপনের যে উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অমূল্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মাতৃভূমির উদ্দেশে যে প্রাণ-ভরা উক্তি, যে প্রগাঢ় ভক্তি, যে নিঃশেষ আত্মদান ও যে নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট, তাহার তুলনা বেশী কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তিনি বলিয়াছিলেন,—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" ইহা প্রকৃত দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি। "সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি," এ কথা বঙ্কিমবাবুই বাঙ্গালীকে প্রথম শুনাইয়াছিলেন। বিবেকানন্দও অনেকটা এই ভাবের ভাবুক, এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। দেশবাসীর প্রতি তাঁহার প্রধান উপদেশ—"এক্ষণে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্ব্বত্র তাঁহার, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। * * * তোমার চতুর্দ্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না ? যখন তুমি এই দেবতার

উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে।" "তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমরা নিজেদের ঘোর কুকর্ম্ম-ফলে কষ্ট পাইতেছ, তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না!"

ধর্ম্মের বেদীর উপর স্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্পষ্টই বলিতেন,—'এদেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম;—আর তোমার রাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটান, প্লেগ-নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এ সব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে; নইলে তোমার চেঁচামেচিই সার।" তাঁহার গুরু-ভাই গিরিশচন্দ্রও এই মতাবলম্বী ছিলেন। বিবেকানন্দের বিয়োগের অনতিকাল পরেই গিরিশের 'সৎনাম' নাটক লিখিত হয়। এই গ্রন্থে দেখা যায়, গীতার—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।"

এই উপদেশকে মূলমন্ত্র করিয়া জাতি-জাগরণের চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। গিরিশের 'সৎনাম' ও ক্ষীরোদের 'প্রতাপাদিত্য' এই দুইখানি নাট্যগ্রন্থও এ যুগের মূল্যবান্ সামগ্রী। ১৩১১ সালে 'সৎনাম' মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কোনও কারণবশতঃ প্রায় দেড় বৎসর কাল এই গ্রন্থ অমুদ্রিত ও অনভিনীত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মুসলমানগণ এই নাটকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়ায় ইহার অভিনয়ও তিন রাত্রির অধিক হইতে পায় নাই। যাহা হউক, নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত এমন স্বজাতি-প্রীতিমূলক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবিকই বিরল।

রচনা-কাল-হিসাবে 'প্রতাপাদিত্য' 'সৎনামে'র পরবর্ত্তী নাটক হইলেও সাধারণে 'প্রতাপাদিত্য'কেই প্রথম পুস্তক বলিয়া জানে। কারণ, 'সৎনামে'র পূর্ব্বে উহা প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল। 'প্রতাপাদিত্যে'র কথা শুধু বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে নয়, স্বদেশী যুগের ইতিহাসেও বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের তখনও সূত্রপাত হয় নাই বটে, কিন্তু ভারত-সরকারের 'হোম

ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী হার্বার্ট রিজলী সাহেবের স্বাক্ষরিত বঙ্গ-ভঙ্গের প্রস্তাব তখন প্রকাশিত হইয়াছে। এমন সময়ে বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতা যে কি, তাহা 'প্রতাপাদিত্য' নাটক বাঙ্গালীকে দেখাইয়া দেয়। ইহার এক নায়ক বলিতেছে,—"একা বাঙ্গালী মহাশক্তি ; জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান্ সম্রাটেরও পূজনীয়, কিন্তু একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ, হীন হতেও হীন; অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।"—এই রোগে কেবল বাঙ্গালী নহে, সমগ্র হিন্দুজাতিই যে মরণোন্মুখ, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত গিরিশের নাটকেও যথেষ্ট আছে।

'প্রতাপাদিত্য' নাটকে বঙ্গমাতার যে রূপ-বর্ণনা আছে, তাহাও মনে রাখিবার যোগ্য। এই নাটকের এক স্থানে আছে, যশোরেশ্বরীর সেবিকা বিজয়া পুরোহিত চন্ডীবরকে বলিতেছেন,—"মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনা-জল-সম্পূর্ণা অমৃতরূপিণী ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চির-তুষার-ধবলিত হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ, চিরশ্যামল শস্য-সম্পদ্ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিল-কুন্তলা, অনন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশির শুভ্র-তরঙ্গ-ফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গমাতার কিসের অভাব চন্ডীবর! যাঁর জলে স্বর্ণ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষ-কুসুমের কোমলতা, যাঁর ললাট শশিসূর্য্যকরোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধুগন্ধ-কুসুম-শীকরবাহী, সে বঙ্গের জন্য আর ধন-রত্ন ভিক্ষা কেন?"

এই সব দেশপ্রীতির ভাব প্রচার-দ্বারা বঙ্গ-রঙ্গালয় তখন দেশের যে কি উপকার করিয়াছিল, সে কথা স্বদেশী যুগের ভাব-রাজ্যে যিনি ঐরাবত-শক্তি সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে দেশ যখন তরঙ্গায়িত, সেই সময়েই—অর্থাৎ, ১৩১৩ সালে, বিপিনচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন,—"বৎসরাধিক কাল ধরিয়া, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি নূতন নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বঙ্গ-রঙ্গালয়সকল যে অভিনব শক্তির সঞ্চার করিয়াছে, তাহারই ফল-স্বরূপে আমরা এই বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন জাগ্রত করিতে পারিয়াছি, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।"

স্বদেশী যুগ

বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের সময়কে লোকে সাধারণতঃ স্বদেশী যুগ বলিয়া থাকে। ১৩১২ সালের শেষকাল হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত এই যুগের স্থিতিকাল। এ সময়টাকে যে হিসাবে স্বদেশী যুগ বলা হয়, সে হিসাবে এই সময়কার বঙ্গসাহিত্যকে 'স্বদেশী সাহিত্য' বলিলে বোধ করি তেমন দোষের হয় না। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উচ্চ ধ্বনিতে সমগ্র-দেশ তখন প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত। একদিকে যেমন সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের অগ্নিময়ী বাগ্মিতা, তেমনি আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ প্রভৃতির আবেগময়ী গান ও কবিতা,—গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের স্বদেশপ্রেমমূলক নাট্য-গ্রন্থসমূহের প্রাণস্পর্শী অভিনয়,—মুকুন্দ দাসের যাত্রা,—অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি, শ্যামসুন্দর প্রভৃতির দেশাত্মবোধপূর্ণ গদ্য-নিবন্ধ এবং 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর,' 'নায়ক,' 'হিতবাদী' প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিকের জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত ভাবোচ্ছ্বাস, সমগ্র বঙ্গদেশে সে সময়ে স্বদেশ-প্রেমের এক অপূর্ব্ব বন্যা আনিয়াছিল। এমন সাহিত্যিক বোধ হয় তখন অতি অল্পই ছিলেন, যাঁহাকে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য দুই ছত্র কিছু লিখিতে হয় নাই। এ বিষয়ে সকলের সব লেখার কথা বলা এখানে অসম্ভব, এবং বলিবার প্রয়োজনও নাই। একা রবীন্দ্রনাথেরই যত গদ্য ও পদ্য রচনা এ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্ত একত্রে মুদ্রিত করিলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া যায়। সে যাহা হউক, স্বদেশী যুগে স্বদেশপ্রীতির ভাব-ধারাটুকু লোক-লোচনের গোচর করিবার জন্য যতটা বলা প্রয়োজন, এখানে তাহাই বলিব।

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্যোগপর্ব্বে 'মিলন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন'-উপলক্ষে সার্কুলার রোডে যে সভা হইয়াছিল, তাহার কথাই এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। নহিলে সে আন্দোলনের আন্তরিকতা ও গভীরতা এ যুগের পাঠকেরা ঠিকমত বুঝিতে পারিবেন না। স্বদেশপ্রাণ আনন্দমোহন বসু তখন অত্যন্ত পীড়িত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকেই সভাপতি করা হইয়াছিল। তাঁহার ভাষণ ও এই সভার বিবরণ তখনকার 'প্রদীপ' নামক মাসিক পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই সারাংশ এখানে সঙ্কলিত হইল:—

"মিলন-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সম্বৎসর কাল রোগশয্যায় শায়িত, জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে বাস করিতেছেন, তিনি জীবনের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এই সংবাদ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে তাড়িত সঞ্চার করিল। বেলা একটার সময়ে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপ অগ্রাহ্য করিয়া দলে দলে জাতীয় সংকীর্ত্তনের দল রাজপথে বহির্গত হইল। উত্তরে বরাহনগর, দক্ষিণে কালীঘাট, পশ্চিমে হাবড়া হইতে শত শত সংকীর্ত্তনের দল লোয়ার সার্কুলার রোড অভিমুখে যাত্রা করিল। ঘর্ম্মাক্ত দেহে কিন্তু অক্লান্ত মনে হাজার হাজার লোক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা-স্থানে উপনীত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ মাথায় করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, শিখ সমবেত হইলেন। প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে স্থান কুলাইল না, সার্কুলার রোড জন-সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।"

"আনন্দমোহনকে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করাইয়া কয়েকটি ভদ্রসন্তান তাঁহাকে গৃহ হইতে বহন করিয়া আনিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভয়ে সতর্ক হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্বিকাচরণ মজুমদার, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তখন ৫০ সহস্র লোকের কণ্ঠ হইতে যে বিপুল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, জীবনে কেহ কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না।"

"সভার কার্য্য আরম্ভ হইল—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া **বঙ্গভাষায় বক্তৃতা** করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার তেজ অবর্ণনীয়। তিনি বলিলেন, 'যেদিন অনন্তের সহিত মিলিত হইব, সেদিনের বিলম্ব নাই। সুতরাং আমার জীবনের আজ শেষ বক্তব্য যাহা, তাহাই প্রকাশ করিতেছি—এ জীবনে আর বোধ হয় আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।' বসু মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।"

"ইহার পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বসু মহাশয়ের লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। সে বক্তৃতার মর্ম্মমাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

সভাপতির বক্তৃতা

"এক অখণ্ড বঙ্গরাজ্যের অধিবাসিগণ,
হিন্দু ও মুসলমান প্রিয় সুহৃদ্‌গণ,

পুরাকালের এক জন ঋষি এই বলিয়া দেবতাদিগকে ধন্যবাদ অর্পণ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের কৃপায় কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেবের ধরাগমন দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। আমি ঋষি নহি; কোন ঋষির পদ-ধূলি-গ্রহণের উপযুক্ত নহি; কিন্তু তবু আজ আমি এই বলিয়া বিশ্বপতিকে ধন্যবাদ দিই, যিনি ইংরেজ ও ভারতবাসী সকল নর-নারীর পিতা, যিনি ইংরেজ ও ভারতবাসী সকলের সম-বিচারকর্ত্তা—আজ আমি তাঁহাকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমি এই দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া এক জাতির অভ্যুদয় দেখিয়া যাইতে পারিলাম। আমি যেন আজ শ্মশান হইতে উত্থিত হইয়া এই জাতীয় জাগরণ সন্দর্শন করিতে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। বৎসরাধিক কাল যাবৎ আমি কঠিন রোগে শয্যাগত হইয়া সংসারের কার্য্যাবলী হইতে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছি। আপনারা আজ আমাকে রোগ-শয্যা হইতে তুলিয়া আনিয়া বঙ্গের ইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় মহাব্যাপারের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া দিলেন। আপনারা আজ আমাকে মহা সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন। আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

"আজ আমাদিগের শোকের দিন। বঙ্গদেশে একতার ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, সমপ্রাণতা জন্মিতেছিল; রাজ-পুরুষ-দিগের এক হুকুমে বঙ্গদেশ আজ বিচ্ছিন্ন হইল। এই বিচ্ছিন্নতায় যে-সকল ভীষণ কুফল উৎপন্ন হইতে পারে, এস্থলে তাহার আলোচনা করিব না। কিন্তু বিধাতার রাজ্যের এমনি নিয়ম যে, 'কু' হইতেও 'সু' উৎপন্ন হয়। আজ যে ঐ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ মেঘ-সঞ্চার দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে উজ্জ্বল স্বর্ণ-দীপ্তিও দেখিতে পাইতেছি। আজ বঙ্গে দৃঢ়তর ও নবতর জাতীয় একতার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। তাই অদ্যকার দিন আমাদের নিকট মহা আনন্দ ও উল্লাসের দিন হইয়াছে। আমাদের মহাকবি গাহিয়াছেন—"এবার মরা গাঙ্গে বান এসেছে।" এই বানের ডাক আমরা সকলেই কি শুনিতে পাই নাই? এই মহা-গম্ভীর আহ্বান-ধ্বনি আমাদের সকলেরই হৃদয়-দ্বারে আসিয়া কি

পৌঁছে নাই? আজ এই নবীন ও অখণ্ড "বাঙ্গালী জাতি"র জন্ম-ক্ষণে আমাদের প্রাণমন মহোল্লাসে বিশ্ববিধাতার মহাসিংহাসন-পানে উত্থিত হউক! আজ সকলে স্মরণে রাখুন যে, বিদীর্ণ ক্ষেত্র হইতে স্বর্ণশস্য উৎপন্ন হয়, ঘোর মেঘ হইতে জীবনপ্রদ বারিবর্ষণ হয়, ভয়ংকর শীতের গর্ভে মহোজ্জ্বল বসন্তের সূচনা লুক্কায়িত থাকে। আমি বিচ্ছিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী; কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমার প্রাণ আপনাদিগকে আজ যে দৃঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, এবং আপনাদের প্রাণ আমাকে যে দৃঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিতেছে, ইতঃপূর্ব্বে কখনও তেমন প্রেমভাব অনুভূত হয় নাই। 'সরকারী' ছেদনাদেশ আমাদিগের মিলন ঘটাইয়াছে, আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বহু পরিমাণে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে, আমাদিগকে এক-ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে দৃঢ়তর করিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—সুদূর সাগর পর্য্যন্ত আমরা সকলে এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান। বন্ধুগণ, আবার বলুন, হৃদয়ের গভীরতম স্থান হইতে আবার বলুন, আমরা সকলে আমাদের চির প্রিয়, চির গরীয়সী জননী জন্মভূমি এক অখণ্ড বঙ্গমাতার সন্তান। আমাদের সনাতন ধর্ম্ম আমাদের সকলকে নিকট হইতে নিকটতর করিবে, পরস্পরের হৃদয় নিকট হইতে আরও নিকটে আকর্ষণ করিবে—ভাইকে ভাইয়ের সহিত সম্মিলিত করিবে। আর, এই অখণ্ড বঙ্গ-ভবন, অদ্য যাহার ভিত্তি—শুধু এই ভূমিখণ্ডের উপরে নহে, আমাদের সকলের আর্দ্র অশ্রুধৌত হৃদয়ের উপরে অদ্য যাহার ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে,—এই ভবন সেই জাতীয় একতার প্রতিমা বাহ্য নিদর্শন-স্বরূপ আমাদিগের ভবিষ্য বংশীয়দিগের নিকট বর্ত্তমান থাকিবে। এই ভবন আমাদের সকল জাতীয় সম্মিলন, বান্ধব সম্মিলন, নানাবিধ সম্মিলনের স্থল হইবে।"

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের মহা আন্দোলনে সমগ্র বঙ্গদেশ গত ২ মাস যাবৎ ওতপ্রোত ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে; এই আন্দোলন প্রাসাদবাসী রাজা জমিদার ও কুটীরবাসী দীন প্রজা সকলেরই চিত্তের অন্তস্তলে গভীর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। যাঁহারা অনুমান করেন যে, এই আন্দোলন কেবল ছাত্রদের বা দুই একটি সম্প্রদায়-বিশেষের কাণ্ড, তাঁহারা বিষম ভ্রান্ত। এই আন্দোলনে আপনারা যে প্রবল উৎসাহ, একাগ্রতা ও স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি শুনিয়াছি, কোন কোন লোক এবং কোন কোন বিশিষ্ট সংবাদপত্র এইরূপ কথা প্রচার করিতেছেন যে

ছাত্রগণ অবাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা আইন ভঙ্গ করিতেছেন। বিশুদ্ধ পবিত্র প্রীতির সহিত আত্মোৎসর্গ যদি আমাদের সাধনা হয়, তাহা হইলে বিশ্বনিয়ন্তা নিশ্চয়ই আমাদিগকে এবং ছাত্রবন্ধুগণ, আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং অক্ষয় আনন্দ ও সুখের অধিকারী করিবেন। সে সুখ যে কিরূপ, যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। আজ আমরা নগ্নপদে শোক-বেশে এই স্থলে উপস্থিত হইয়াছি। ইংরেজদের দুই একখানি দোকান ব্যতীত হিন্দু, মুসলমান ও মাড়োয়ারীর দোকান-পাট হাট-বাজার আজ নীরব ; আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের উচ্চ ধ্বনি নিঃশব্দ।"

"আজ আমরা এস্থলে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছি। বঙ্গদেশে আজ লক্ষ লক্ষ লোক উপবাসী রহিয়াছেন—আজ আর আমাদের রন্ধনশালার অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে না। আসুন, আজ আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে এমন অগ্নি প্রজ্বলিত করি, যাহাতে আমাদিগকে শুচি করিবে এবং আমাদিগের মধ্যে উজ্জ্বলতর ও তীব্রতর উৎসাহানল জ্বালিয়া দিবে।"

"সুহৃদ্‌গণ, এই কয়েকটি কথা বলিয়াই এক্ষণে আমি বিদায় লইতেছি। বন্ধুগণ, বিদায়!—হয়ত অনন্ত কালের তরে ইহলোকে আপনাদিগের নিকট এই আমার শেষ কথা। আজ আমাদিগের হস্তে "রাখীবন্ধন" করা হইয়াছে—আজ এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের দিনে বন্ধুগণ, বিদায়! আজ আমার হৃদয়ে যে সব কথা, যে সকল ভাব প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অব্যক্তই থাকিয়া যাইবে। আজ আমরা সকলে এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের কার্য্যে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রতিপদে আমাদের পরিচালক হউক, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হউক। বাক্য নহে, "কার্য্য' এক্ষণে আমাদের মন্ত্র হউক। তাহা হইলেই আমার স্বপ্ন সার্থক হইবে, আমার আশা পূর্ণ হইবে, আমাদের জন্মভূমি প্রাকৃতিক সম্পদে ও সুসন্তানে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিবেন।"

"বক্তৃতা-পাঠ শেষ হইবামাত্র শিখ-গুরু কুঁয়ার সিংহ পট-মণ্ডপের সম্মুখে উপনীত হইলেন। তাঁহার বীর-বেশ, সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ বর্ণের পরিচ্ছদ, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের সুদীর্ঘ উষ্ণীষ। সে উষ্ণীষে সুতীক্ষ্ণ লৌহ-চক্র, লৌহ-তীর প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্র। তাঁহার সঙ্গে ভীমকায় কয়েকজন শিখ। তাঁহার দর্শন মাত্রে ৫০ সহস্র লোক জয়-ধ্বনি করিল। সমস্ত লোক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। সুরেন্দ্রনাথ

সসম্মানে তাঁহার হস্তে রাখী বন্ধন করিলেন। শিখগুরু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাঙ্গালীর পশ্চাতে সমস্ত পঞ্জাব বিদ্যমান আছে।" অবশেষে নিম্নলিখিত ঘোষণা-পত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়ঃ—

ঘোষণা

"যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

"ইহার পর ভিত্তি-স্থাপনের সময় উপস্থিত হয়। কয়েকটি যুবক বলিল, "আজ বুকের রক্তে ভিত্তি-প্রস্তর অনুরঞ্জিত করিয়া দিতে সংকল্প করিয়াছি।" বহু অনুরোধে তাঁহারা দুঃখের সহিত এই সংকল্প পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকলে ভিত্তি-স্থাপনের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুবকগণ রবীন্দ্র-রচিত যে গানটি তখন গাহিয়াছিলেন, তাহার প্রথমাংশ এই—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!"

ইহার পর, ১৩১৩ সালের ১৫ই বৈশাখ, কলিকাতার এক বিরাট জন-সভায় রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তাহাতে বলেন,—"ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান—আজ বাংলাদেশের দুর্য্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরি-শিখরের মত বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়ক-রূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য

আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আজ আহ্বান করিতেছি।"—সাহিত্য-ক্ষেত্রের অধিনায়ক-কর্ত্তৃক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অধিনায়ককে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে দেশনায়কের পদে বরণ, এদেশে এই প্রথম। কবিবরের এ আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই। দেশের প্রায় সকলেই সুরেন্দ্রনাথের পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিলেন।

এই বৎসরের আর একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য। এই বর্ষের সাহিত্য-সম্মিলনে সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি সাহিত্যসেবক নই। মাতৃভাষার সেবা করলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আমি আজীবন বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেছি, বিদেশী রাজার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করে বেড়িয়েছি। কিন্তু এ-কথা আমাকে স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে, দেশের সাহিত্যই দেশের গৌরব, দেশের প্রাণ, দেশের মান, দেশের আশা-ভরসাস্থল। যখন দেশের লোকের মনে কোন নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়, কিংবা দেশের মধ্যে কোন নূতন আবেগ উপস্থিত হয়, তখন জাতীয় সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাহিত্যে সেই ভাব, সেই আবেগ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। * * * দেখুন, এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের কি উপকার হচ্ছে। * * আমি বেশ জানি, সাহিত্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ডান হাত, জাতীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি।" অনেকে বোধ করি জানেন না যে, ইহাই সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বাঙ্গালা বক্তৃতা।

"দেখুন, এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের কি উন্নতি হচ্ছে।"—সুরেন্দ্রনাথের এ উক্তি অবশ্য অসত্য নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যের সহায়তা না পাইলে স্বদেশী আন্দোলনও তখন অতটা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। জগতের অধিকাংশ আন্দোলনই ব্যথা বা দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা মাত্র। এই দুঃখোপশান্তির চেষ্টায় ভাবের উদ্বোধন ঘটে। ফলে, ভাবের উদ্বোধন ও সাহিত্যের সৃষ্টি অনেক সময়ে এক সঙ্গে হয়। স্বদেশী যুগেও তাহাই হইয়াছিল। আজ যে 'বয়কট' শব্দ আমাদের ঘরোয়া কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই আন্দোলন হইতেই উহার প্রচলন আরম্ভ হয়। এই 'বয়কট'-প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব বাগ্মিবর লালমোহন ঘোষের কীর্ত্তি। দিনাজপুরে তিনি বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ-রূপে বিদেশী-বর্জ্জনের প্রস্তাব প্রথম করিয়াছিলেন। এই বিদেশী-বর্জ্জনই এই আন্দোলনের প্রাণ ছিল।

রাজনীতিক ও সাহিত্যিক সকলে প্রায় একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া—কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া যেন এই সুরই ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিলেন,—

"নব বৎসরে করিলাম পণ—লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে হে ভারত, লব শিক্ষা!
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা!"—রবীন্দ্রনাথ

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম মুখেই অমৃতলালের এই গানটি রচিত হয়ঃ—

"ওরা জোর করে দেয় দিক্ না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে
মিশিয়ে প্রাণ।

আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম-কাঙ্গালী—
ভাবছিস্ তোরা—মন ভাঙালি,
তা' নয়,—জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ
বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।

আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাইনে
তোদের লবণ দান।

আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্,
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক,
তোদের ওই চক্চকান মধুর চাকে
করবো না আর বিষ-পান।

তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেলবো ভেঙে মেরে তুড়ি,
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী
শাঁখার আবার রাখবে মান।"

এদিকে কান্ত-কবি রজনীকান্ত গান ধরিলেন,—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ—
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।

* * *

আয় রে আমরা মায়ের নামে এই
প্রতিজ্ঞা কর্‌বো ভাই!
পরের জিনিষ কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরে জিনিষ পাই।"

দেশবাসীর প্রাণে ঐ বিদেশী-বর্জ্জনের ভাব জাগাইবার জন্য 'হিতবাদী'র কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গান লিখিলেন,—

"দেখরে চেয়ে বাজার ছেয়ে, আস্‌তেছে মাল বিদেশ হ'তে!
আমাদের বেচা কেনা, পাওনা দেনা অভাবমোচন পরের হাতে,
আমাদের পিতল কাঁসা, ছিল খাসা, কাজ চালাতাম কলার পাতে।
এখন এনামেলে, মাথা খেলে কলাই করার ব্যবসাতে।
এখানে পরশ পাথর পায় না আদর, চটা উঠ্‌ছে পেয়ালাতে।
যত ঠুন্‌কো পলকা, দরে হালকা—দ্বিগুণ মূল্যে পালটে নিতে।।
ঘরে নাইকো আহার, বেশের বাহার, যাহার তাহার পথে ঘাটে!
হায় রে নিজের দেশে যায় না অভাব, অশন বসন সব বিলাতে।
ছেড়ে পরের ঠাকুর, ঘরের কুকুর ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ, ছাড়তে নারে কেঁদে মরে, কার্য্য সারে কোন মতে।"

উপরি-উদ্ধৃত কয়টি গানই তখন বাঙ্গালার ছেলেরা পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে,—সর্ব্বত্রই গাহিয়া বেড়াইয়াছিল।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তখন ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিবার জন্য কেবল বলিতেছিলেন—"গণ্ডিভ্রষ্ট হইও না। নিজেদের সর্ব্বস্বের প্রতি

মমতাযুক্ত হও। যে শক্তি আজ সুষুপ্ত, তাহাই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্ব দুর্গতি মোচন করিবে। কিন্তু পরমুখী হইলেই সর্ব্বনাশ।"

ভক্ত রামপ্রসাদের গানে যেমন কোথাও শ্যামা-মায়ের প্রতি অভিমান, কোথাও নিজের উপর ধিক্কার এবং কোথাও বা মাতৃগৌরবে গৌরব-বোধের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি এই সময়ের জাতীয় সঙ্গীত বা কবিতাগুলিতেও কতকটা ঐরূপ নানা ভাবের তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখা গিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ গান লিখিলেন,—

"আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে (মরি হায় হায় রে)
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি মধুর হাসি।।
কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে;
মা, তোর মুখের বাণী আমার কাণে
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায় রে)
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে, আমি নয়ন-জলে ভাসি।।
* * *
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাওয়ার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা তোমার পল্লীবাটে;
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে (মরি হায় হায় রে)
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, তোমার রাখাল তোমার চাষী।।"

এই গানের কতকটা প্রত্যুত্তর-স্বরূপ গিরিশচন্দ্রও 'সন্তানের উক্তি' নাম দিয়া এই কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেন,—

"শুনি মা তুই সোণার বাংলা,
শুনি যেমন সোণার কাশী।
তুই যদি মা সোণার বাংলা,
আমরা কেন উপবাসী!

ঘর ফুঁড়ে তোর আসে আকাশ,
দীর্ঘ শ্বাসে তোমার বাতাস,
কাণের কাছে সদাই হা-হা,
সে তো নয় মা মধুর বাঁশী!

* * *

নাইকো মা তোর আমের বাগান,
ম্যালেরিয়ায় করলে শ্মশান,
নাইকো শোভা, নাইকো ছায়া,
পাখী হয়েছে উদাসী!

অন্ন নাই রাখালের পেটে,
গরু গেছে 'নিউ মার্‌কেটে,'
আঙিনাতে ধুলো উঠে,
ধুঁকে পড়ে আছে চাষী!"

আবার এই কবিতারই সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেই উহার প্রত্যুত্তরে 'মায়ের উক্তি'- হিসাবে বলিয়াছিলেন,—

"ঘুমিয়ে আছ অঘোর হ'য়ে,
তাইতে থাক উপবাসী।
ডাকি কত উঠো না তো,
চোখের জলে সদাই ভাসি।

নগ্ন থাকো বসন বিনে,
পরের কাছে আনি কিনে,
আরো কি হয় দিনে দিনে,
হয়েছি তো পরের দাসী।

* * *

নির্ভাবনায় টাকা আনো,
চাকরী বড় জবর জানো,
ফুলের মালা ব'লে গলায়,
পরেছ গোলামী-ফাঁসী।

* * *

সোণার আমি যাদুমণি,
ক্ষেত্র আমার সোণার খনি,
ভ্রাতৃ-প্রেমের বিমল জলে
ধোও রে মায়ের মলারাশি।"

এদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাহিলেন,—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক বদন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্তকোটি সন্তান যার, ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে, ডাকে যখন আমার দেশ।

* * * *

কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার
ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা—
নহি তো মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?"

স্বদেশী যুগে যত গান রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহার তুল্য সমাদর-লাভ বোধ করি আর কোনও গানের ভাগ্যে তখন ঘটে নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের "ধন-ধান্য পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানটিও বাঙ্গালীর কণ্ঠে-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল! তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"ধন-ধান্য পুষ্প-ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—
সকল দেশের সেরা;
ও যে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।—

(কোরাস্)—

এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
কোথায় উজল এমন ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে;
ও তার, পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে।

(কোরাস্)—

এমন দেশটি ইত্যাদি—

* * * *

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে;
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।"

অতুলপ্রসাদ সেনের এই সুন্দর বন্দনা-গানটিও এই সময়ে সমাদর লাভ করিয়াছিল—

"বল বল বল সবে, শত বীণা-বেণু রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী;
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা, গোদাবরী—
এখনও অমৃত-বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা, বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরবকাহিনী!
(কোরাস্—বল বল বল ইত্যাদি।)

বিদুষী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র-প্রসূতি,—
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
(কোরাস্—বল বল বল ইত্যাদি।)"

এইরূপ 'আমার দেশ,' 'আমার সোণার বাংলা,' 'আমার জন্মভূমি' প্রভৃতি ধুয়া-বিশিষ্ট গানে ও কবিতায় বঙ্গদেশ যখন মুখরিত, তখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গরীব কবি গোবিন্দ দাস বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন,—

"স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়!
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়!
* * * *
এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া—
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি, জগৎ-ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোদের নয়!

কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে,
জোর-জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয়?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ কাণা খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা, পাঙ্খা কুলী—পীলা-ফাটার ভয়!
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয়?
* * * *
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোদের নয়!
'যাহার লাঠি, তাহার মাটি'—চিরদিনের কথা খাঁটি,
এ তো নহে চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয়!
দেখ্‌তে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপনি মরে,
ঘুসির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়!'
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোদের নয়!"

আবার ইহারই প্রায় এক বৎসর পরে তিনি এই মিলন-মঙ্গল গাহিয়াছিলেন,—

"আমরা হরিহর,
আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম,
হৌক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সাদিয়া সিন্ধু সেতু-রামেশ্বর।

আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো,
খড়্গী বর্গী গুর্খা জাঠ্ আর পার্শী সওদাগর।

পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর।

কেউ বা চরণ, কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত-মাংস আমরা পরস্পর।
আমরা হরিহর।

একই সলিল, একই বায়ু,
একই মৃত্যু পরমায়ু,
একই মোদের শীত-বসন্ত একই দিবাকর।

একই মোদের ক্ষুৎ-পিপাসা,
একই ভরসা, একই আশা,
এক আকালে, এক পেলেগে, মরি নিরন্তর।

* * *

একই মোদের দণ্ডবিধি,
একই মোদের গুণের নিধি,
এক চরণে তিরিশ কোটি লুটি নারী-নর।

* * *

আয় রে আমরা তিরিশ কোটি,
ভাই-ভগিনী সবাই যুটি,
লভি আজ সে নূতন শক্তি, নূতন কলেবর,

আয় রে আমরা আগাগোড়া,
ভাঙ্গা-ভারত লাগাই জোড়া,
আয় রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর।"

বাঙ্গালার বালকগণের মনে স্বদেশ-হিতৈষার ভাব উদ্রেক-উদ্দেশ্যে তখন যোগীন্দ্রনাথ বসু 'ভারতের মান-চিত্র' ও 'দেশ-ভক্তি' প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছিলেন। এ দুইটি কবিতাই অনেক স্কুল-পাঠ্য পুস্তক-মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 'দেশ-ভক্তি' কবিতার এক স্থানে আছে,—

"সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভাল
স্বদেশ-জননী?
কহি বটে, "তুমি মোর সাধনার ধন,
নয়নের মণি।"
কিন্তু যবে অন্তরের অন্তরেতে
করি নিরীক্ষণ,
বুঝি, সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন, অলীক বচন।

* * *

সত্য দেশ-ভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়;
দেশ-ভক্তি ত্যাগে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে;—
বচনেতে নয়।"

মুকুন্দ দাসের 'মাতৃ-পূজা' নামে যাত্রাও এই সময়ে স্বদেশী ভাব-প্রচার-কার্য্যে স্বল্প সাহায্য করে নাই। 'মাতৃ-পূজা'র একটি মর্ম্মস্পর্শী গান পাঠকগণকে এখানে উপঢৌকন দিলাম,—

"আর আমরা পরের মাকে মা বলে আর ডাকব না।
জয় জননী জন্মভূমি তোমার চরণ ছাড়ব না।।
ফিরব না আর দ্বারে দ্বারে, ভাসব না আর নয়ন-নীরে,
কি সুধা তোর হৃদয়-ক্ষীরে—জীবনে মা ভুলব না।
কি করুণা, কি মহিমা, কি অতুল মধুরিমা,
সুজলা—সুফলা শ্যামা এমন মা আর পাব না।"

এদিকে এই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বঙ্গ-রঙ্গালয়সমূহ গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা,' 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি'; ক্ষীরোদ-

প্রসাদের 'নন্দকুমার,' 'পলাশির প্রায়শ্চিত্ত' ও 'বাঙ্গালার মস্‌নদ' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস,' 'মেবার-পতন' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া দেশের যে মঙ্গল সাধন করিয়াছিল, তাহার বোধ করি তুলনা হয় না। মনে পড়িতেছে, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের দর্শকবৃন্দে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ। তাহারা মুগ্ধ চিত্তে উৎকর্ণ হইয়া সিরাজের এই হৃদয়ভেদী উক্তি শুনিতেছে,—

"ওহে হিন্দু মুসলমান,
এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন ;
হই বিস্মরণ পূর্ব্ব-বিবরণ ;
করো সবে মম প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন!
আমি মুসলমান, করি বাক্য-দান,
ভুলে যাব যাহা আছে মনে ;
পূর্ব্ব-কথা আলোচনা নাহি প্রয়োজন।
সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত,
বাঙ্গলার ক্ষতি নাহি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—
নাহি দিয়ো ফিরিঙ্গীরে সূচ-অগ্র স্থান।
জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্য-লিপ্সা প্রবল সবার।
দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যাভার,
ছলে-বলে বিস্তার করিছে অধিকার।
ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ,
মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী।
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু মুসলমান,
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গী-নফর।
শত্রু-জ্ঞানে ফিরিঙ্গীরে কর পরিহার!
বিদেশী ফিরিঙ্গী কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর—চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার।"

'বিদেশী ফিরিঙ্গী কভু নহে আপনার'—এ কথা বাঙ্গালার জন-সাধারণ তখন গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিমে'র অভিনয় দেখিয়া যেমন উপলব্ধি করিয়াছিল, তেমন মনে হয় আর কিছুতে নয়। ফিরিঙ্গী-চরিত্রের যথাযথ চিত্র এ দেশে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'ধর্ম্ম' নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। এই বৃহৎ দেশ যদি অসভ্য, দুর্ব্বল বা নির্ব্বোধ ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহা হইলে এইরূপ কথা বলা যাইত না। কিন্তু ইংরাজও তখন অসুর ছিলেন, ভারতবাসীও অসুর ছিলেন। তখন দেবে অসুরে যুদ্ধ হয় নাই। অসুরে অসুরে যুদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য-অসুরে এমন কি মহৎ গুণ ছিল, যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি সফল হইল? ভারতবাসী-অসুরে এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল, যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি বিফল হইল?"—এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিম' নাটকদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গে যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। যে মহৎ গুণের প্রভাবে ইংরেজ-অসুর এ দেশের অসুরকে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহার নাম—জাতীয় ভাব। এই মহৎ গুণ এ দেশবাসীর মধ্যে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারই প্রকৃত চিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ঐ দুই ঐতিহাসিক নাট্য-পটে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। সিরাজ ও মীরকাসিমের প্রতি দেশের জন-সাধারণের যে প্রীতির ভাব আজ পরিলক্ষিত হয়, তাহাও প্রধানতঃ ঐ দুই নাট্যাভিনয়ের ফল। বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন-কালে বাঙ্গালার রঙ্গালয়গুলি বাঙ্গালীকে কি বুঝাইয়াছিল—কি শিখাইয়াছিল, সে সব কথা খুলিয়া বলিতে বড় একটা কাহাকেও দেখি না বটে, তবে মনীষী বিপিনচন্দ্র সে সময়ে একবার লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন ও তন্নিহিত স্বদেশহিতৈষার অভিনব ও প্রাণময় আদর্শ—এতদুভয়ই বহুল পরিমাণে বাংলা নাট্যকলা ও বঙ্গীয় রঙ্গালয়সকলের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টার ফল। আরো অনেকে এক্ষেত্রে কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বঙ্গ-রঙ্গালয়সমূহ যেরূপ ভাবে, যতটা বিস্তৃতরূপে ও যে পরিমাণে সফলতা-সহকারে এ কার্য্য করিয়াছে, আর কেহ সেরূপ করিয়াছে কিনা, সন্দেহ।"

এ সময়ে বিপিনচন্দ্রও কম কাজ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতার প্রসঙ্গ না তুলিয়া শুধু তাঁহার তৎসাময়িক প্রবন্ধসকলের কথা মনে

করিলেই দেখা যায় যে, সে সমস্ত রচনা শুধু স্বদেশী আন্দোলনের নহে—স্বদেশী সাহিত্যেরও বিশেষ উপকার করিয়াছিল। তাঁহার 'কংগ্রেস,' 'নেশন্ বা জাতি,' 'মায়ার পথ ও মুক্তির পথ' 'শিবাজী উৎসব' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধ জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারে নানা নূতন তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করিয়াছিল। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' গানের ব্যাখ্যা তখন অরবিন্দও করেন, পাঁচকড়ি বাবুও করেন, এবং এই দুইটি ব্যাখ্যা অতি উপাদেয় হইলেও বিপিনচন্দ্র-কৃত ব্যাখ্যায় যে অভিনব বিচার-বিতর্ক ছিল, তাহার পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। পাঠকগণের কৌতূহল-চরিতার্থের জন্য তাহার সামান্যাংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"বন্দে মাতরম্—গান নহে, মন্ত্র। প্রত্যেক মন্ত্রের একজন ঋষি, ও এক বা ততোধিক দেবতা থাকেন। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি—সন্তান-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, পুরোহিত—বঙ্কিমচন্দ্র, দেবতা—জন্মভূমি। * * * এই মন্ত্র জপিতে জপিতে, যে মাতৃরূপ সাধকের মানস-চক্ষে মন্ত্র-শক্তি-প্রভাবে, গুরু-কৃপায়, আপনি স্ফুরিত হইয়াছিল,—বঙ্কিমচন্দ্র এই সঞ্জীবনী সঙ্গীতে তারই বর্ণনা করিয়াছেন। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত মায়ের সাধন-মন্ত্র নহে, মায়ের স্তব। * * * মন্ত্র অন্তরঙ্গ সাধন, স্তব বহিরঙ্গ সাধন ; মন্ত্র সূত্র, স্তব বৃত্তি। বন্দেমাতরম্ মায়ের সাধন-মন্ত্র ; সুজলাং সুফলাং ইত্যাদি মায়ের স্তব। আগে মন্ত্র, পরে স্তব। মন্ত্র-প্রভাবে দেবতা প্রকাশিত হইলে, স্তব সেই প্রকাশের ছবি আঁকিয়া, তাঁহার রূপ-গুণের বর্ণনা করে। বন্দে মাতরম্—জপিতে জপিতে সাধকের চক্ষে যখন 'মা' প্রকট হইলেন, তখনই তাঁহার বন্দনা আরম্ভ হইল। তখনই সাধক মায়ের স্বরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।" বর্ষাকালে আতট-তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ, জলাকীর্ণ প্রান্তর,—জলদবরণ আকাশ, নিত্যস্নাত প্রকৃতি—সকলেই তো দেখে। তুমি আমি আজন্মকালই তো দেখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এর ভিতরে মাকে তো দেখি নাই। গ্রীষ্মে ফলভারাবনত বনস্থলী, হেমন্তে শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, বসন্তে ফুল্লকুসুমিত, মলয়-সেবিত, বিহগ-মধুকর-মুখরিত পাদপরাজি, শরতে জ্যোৎস্না-ধৌত পৃথিবী—এ সকল কে না দেখিয়াছে? কিন্তু এ যে মায়ের মূর্ত্তি, ইহা ক'জনে আগে জানিত, এখনই বা ক'জনে এ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে? মন্ত্র-সাধক ভিন্ন অপরের নিকট এ মূর্ত্তি

প্রকাশিত হয় না। * * * দেব-প্রতিমায়, প্রাকৃতজনে খড় ও মাটি, পাথর বা ধাতুই প্রত্যক্ষ করে; সাধক কেবল তাহার মধ্যে আপনার ইষ্টদেবতাকে দর্শন করেন। সেইরূপ স্বদেশের বিগ্রহে, অভক্তজনে কেবল মাটি, জল, গাছ, পাথর, পর্ব্বত-প্রান্তর, এ সকল জড় ও উদ্ভিদাদিই দেখে; ভক্তজনে এই বিশাল বিগ্রহে মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হন। কেবল তাঁহাদেরই নিকটে 'বন্দে মাতরম্' শুদ্ধ শব্দ নহে, কেবল কল্পনা বা কবিতা নহে; কিন্তু মায়ের সাধন-মন্ত্র, মায়ের স্বরূপের সঙ্কেত, মায়ের স্মারক চিহ্ন।"—বলিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ হয় যে, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ এই সঞ্জীবনী সঙ্গীত-সুধার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধ পাইয়া ইহার অঙ্গচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধ অরবিন্দ বাবুর 'ধর্ম্ম' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। অরবিন্দও এই পত্রে গীতোক্ত ধর্ম্ম-সহায়ে জাতীয় ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার 'গীতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন,—"জাতীয় মহত্ত্ব কেবল ক্ষাত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, চতুর্ব্বর্ণের চতুর্ব্বিধ তেজেই সেই মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজ রাজসিক ক্ষাত্রতেজকে জ্ঞান, বিনয় ও পরহিত-চিন্তার মধুর সঞ্জীবনী সুধায় জীবিত করিয়া রাখে, ক্ষাত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষাত্রতেজ-রহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণসকলকে আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ। যদি ক্ষত্রিয়-বংশের লোপ হয়, নূতন ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্ত্তব্য। ব্রহ্মতেজ-পরিত্যক্ত ক্ষাত্রতেজ দুর্দ্দান্ত উদ্দাম আসুরিক বলে পরিণত হইয়া প্রথম পরহিত বিনাশ করিতে চেষ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। সত্ত্ব রজঃকে সৃষ্টি করিবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা করিবে, সাত্ত্বিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা হইতে পারে না, ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলে শূদ্র রাজা হইবে; ব্রাহ্মণ তামসিক হইয়া অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া শূদ্রের দাস হইবে, আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেষ্টতাকে পোষণ করিবে, স্বয়ং ম্লান হইয়া ধর্ম্মের অবনতির কারণ হইবে। নিঃক্ষত্রিয় শূদ্র-চালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতের এই অবস্থা ঘটিয়াছে।"

অরবিন্দের অধিকাংশ রচনাই তখন ঐ ভাব-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও কতকটা এই ভাবের ভাবুক

ছিলেন। হিন্দু তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলে যে স্বরাজ লাভ করিবে, এই কথাই তিনি নানা ভাবে বারংবার ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—"স্বে মহিম্নি রাজতে—নিজের মহিমায় বিরাজ করাই স্বরাজ।" "দেশের লোকেরা যাহাতে ঘর ছাড়িয়া পরকে আপন না করে, তাহার জন্য আয়োজন করা চাই। আমার দেশ, আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার জাতি, আমার ধর্ম্ম—যা কিছু আমার ভাল-মন্দ—সুশ্রী-বিশ্রী সমস্তকে ভালবাসিতে হইবে।"

বাঙ্গালাদেশের দুর্ভাগ্য যে, এই সময়ে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—এই দুই স্বদেশ-প্রাণ কর্ম্মবীরকে হারাইয়াছিলাম। ইঁহারা উভয়েই একই বৎসরে—অর্থাৎ ১৩১৪ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। জাপান হইতে প্রত্যাগমন-কালে জাহাজে বিশারদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বসিয়া তিনি মাতৃভূমির উদ্দেশে এই অসমাপ্ত কবিতা লিখিয়াছিলেন,—

"এই কি জীবন শেষ? জীবন-রঞ্জিনি!
কোথা প্রিয় জন্মভূমি?
কোথা আমি? কোথা তুমি?
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি?

তোমার মহিমা গাব, ও মা জন্মভূমি!
লাঞ্ছিত তোমার নাম,
দেখে তবু চলিলাম,
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা—দেখিলে ত তুমি!

এ দুঃখ রহিল মনে,
তোমার সন্তানগণে,
না দেখিয়া সমাদৃত,—শমন-সদনে
যেতে হ'ল!—মন-সাধ রহিল মা মনে!"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও তখন ব্রহ্মবান্ধবের সুরে সুর মিলাইয়াছিলেন। "এই যে ত্রিশ কোটি ভারতবাসী নরনারী, এই সপ্ত সরিদ্বরা ভারতভূমি, এই কাশী-কাঞ্চী-দ্রাবিড়, কামরূপ-পাঞ্চাল, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ—এ সকলই আমার,—আমার আমিত্বের প্রসারক্ষেত্র, আমার

আত্ম-পরিচয়ের—পিতৃ-পরিচয়ের গয়াধাম।”—এই দেশাত্মবোধের সুরই তখন দৈনিক ‘নায়ক’ কাগজের অনেক লেখাতেই ফুটিয়া উঠিত। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যে ‘দেশাত্মবোধ’ শব্দের আজ এত ছড়াছড়ি, সে শব্দ সে-সময়ে আমরা সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের নিকটই প্রথম শুনি। এই সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম গণেশ-দেউস্কর ও ‘নব্য-ভারত’-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরীর নামও উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের ‘ব্রত-কথা’ ও সখারামের ‘দেশের কথা’ নবজাত স্বদেশী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাইবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তখন ‘দেশভক্তি,’ ‘বঙ্গ-বিভাগ,’ ‘পল্লী-বিলাপ,’ ‘বঙ্গদেশ ও বঙ্গমঙ্গল,’ ‘বঙ্গ-স্বাধীনতা,’ ‘আবাহন,’ ‘অকিঞ্চনের নিবেদন’ প্রভৃতি ছোট ও বড় কত বাঙ্গালা গ্রন্থ যে রচিত হইয়াছিল, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। এ সময়ে এমন লেখক খুব কমই ছিলেন, যিনি এ বিষয়ে অন্ততঃ এক-আধটি গান বা কবিতা রচনা করেন নাই। এমন কি, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও অনাথবন্ধু সেনও ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। বিপিনবাবু গান লিখিয়াছিলেন—

“আর সহে না, সহে না, সহে না জননী, এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশিদিন, হয়ে শক্তিহীন, পড়ে থাকি প্রাণ চাহে না।
তুমি মা অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার?
দানব-দলনী ত্রিদিব-পালিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা,
উঠ মা, আজিকে সে রূপে পরাণে, ডাকি মা কালিকে,
ডাকি মা সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননি, নহিলে এ ভয় যাবে না।”

অনাথবন্ধুর গানঃ—

“হাতে রাখী পরি, আজি বেঁধে লই প্রাণ,
একান্তে বিস্মৃত হও স্বার্থের সন্ধান।
সর্ব্বস্ব করিয়া ত্যাগ,
আনো প্রাণে অনুরাগ,
বিরাগী সন্ন্যাসী সাজো—সাধক-প্রধান।
প্রকৃত ভক্তের ন্যায়,
প্রেমানন্দ-গরিমায়,
করিও জীবন-পণে যত্ন সমাধান।
হাতে রাখী বাঁধিয়াছ, বাঁধ আজি প্রাণ।”

স্বদেশী যুগের সাহিত্যে অশ্বিনীকুমারের দান তেমন বেশী না হইলেও তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জীবন—স্বদেশ-ভক্তের জীবন। শুনিতে পাই, কংগ্রেসের সূচনা-কালে বরিশালে জাতীয় সঙ্গীতের যে নগর-সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তাহার মূলে ছিলেন অশ্বিনীকুমার এবং সে সব সংকীর্ত্তনের অধিকাংশই তিনি রচিয়াছিলেন। দুষ্প্রাপ্য বলিয়া তাহার একটি গান উদাহরণ-স্বরূপ এখানে প্রকাশ করিলাম।—

"একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন।"

স্বদেশী যুগে অশ্বিনীকুমার আরও কিছু চড়া সুরে গান ধরিয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহার রচিত 'শ্মশান' শীর্ষক গানটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"শ্মশান ত ভালবাসিস্ মাগো, তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
দেখ্‌সে হেথা কি হ'য়েছে,
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি।
ভূত পিশাচ তাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না হেথা নাচ্‌বি শ্যামা,
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজ্‌বে দামা—দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলি।"

এই সঙ্গীত স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহার প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত নবীনচন্দ্রের 'শব-সাধন' নামক কবিতার কথা। তাহাতে 'শক্তি-আরাধনা'র নিমিত্ত স্বদেশবাসীকে কবি আহবান করিয়াছিলেন।

স্বদেশী যুগে সে আহ্বান সার্থক হইয়াছিল। স্বদেশী যুগ সত্যই শক্তি-সাধনার যুগ। সে শক্তি-সাধনায় উৎসাহ-সঞ্চার-উদ্দেশ্যে বঙ্গ-সাহিত্য তখন কি করিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় এখানে দিতেছি।

বঙ্কিম-যুগে কবি দীনেশচরণ বসু তাঁহার 'বীণা'য় ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিলেন—

"ওরে তন্দ্রি, রাখ প্রেম-গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেও না এখন;
মৃত-সঞ্জীবনী সংগীতি উঠাও,
জাগাও, নিদ্রিতা ভারতে জাগাও,
সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্ব্বত, কন্দর,
কর মৃত দেহে শোণিত সঞ্চার,—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!"

দীনেশচরণের এই মনোভাব বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে প্রায় সকল কবি ও লেখকের মনে যেন সংক্রামিত হইয়াছিল। 'প্রেম-গুঞ্জরণ,' 'বিরহের গান' প্রভৃতিকে চাপা দিয়া মৃত্যু-বরণের গানই বঙ্গ-সাহিত্যে তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। যে কামনার বশে অশ্বিনীকুমার "আয় মা হেথা নাচ্‌বি শ্যামা" বলিয়া শ্মশান-কালীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই কামনা বুকে করিয়া কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য 'সুদর্শনধারী মুরারি'কে আহ্বান করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারি!
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে
কর দীক্ষিত ভারত-নর-নারী।
মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ-নিনাদে,
বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে,
সম্মান শৌর্য্যে পৌরুষ বীর্য্যে
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।
মুক্ত সমুন্নত পতাকা-তলে
মিলাও ভারত সন্তান-সকলে,
নব আশে হিন্দুস্থান ধরুক নূতন তান।

এস অরি-শোণিতে, মেদিনী রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসি ধরি।
এস, ভারত-পাশ-নাশকারী।।"

অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক-কর্ত্তৃক এই সময়ে 'যুগান্তর' নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাগজের অনেক লেখাই তখনকার পাঠক-চিত্তকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিত। এই কাগজেরই কোল আলো করিয়া মরণের এই অপূর্ব্ব মহিমা-গীতি প্রকাশিত হইয়াছিল—

"আয় আজি আয় মরিবি কে?
জরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির, নিশীথ-শ্মশানে পিশাচ অধীর,
থাকিতে তন্ত্র সাধন-মন্ত্র, প্রেত-ভয়ে ছি ছি ডরিবি কে?
অসুর-নিধনে কিসের তরাস? পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস্?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি' বীরের মতন মরিবি কে?
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে ঊর্ম্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে করি ভর, হাসিমুখে সে সাগর, তোরা তরিবি কে?
হউক ভগ্ন, জলধি মগ্ন—তবু তরী বাহি মরিবি কে?
চরণের তলে দলি রিপুদল লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন—
তাদেরই অংশে তাদেরই বংশে জনম, সে কথা স্মরিবি কে?
লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পূর্ণ আর্য্যের মত মরিবি কে?
আয় আজি আয়, মরিবি কে?
মাতি সৌরভে, যশ-গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে?
আয় আজি আয়, মরিবি কে?"

জাতির অভ্যুদয় কামনা করিয়া আমরা লড়াই করিব—মরিব; সেই অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য আমরা যত মরিব, আমাদের জাতি ততই সতেজ, সজীব ও সবল হইয়া উঠিবে—এই ভাবের মরণ-শিক্ষা তখনকার রঙ্গমঞ্চ হইতেও অবিরত প্রচারিত হইয়াছিল। গিরিশ-চন্দ্রের 'ছত্রপতি' নাটক এই ভাবেরই অপূর্ব্ব রস-মূর্ত্তি। ১৩১৪ সালে এই নাটকখানির অভিনয় বাঙ্গালার দুইটি রঙ্গালয়ে এক সঙ্গে সমান সমারোহে বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। ১৩১৫ সালে

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই দত্ত, সত্যেন বসু প্রভৃতি শক্তি-সাধকগণকে আমরা জাতিগত আভ্যুদয়িক মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়িবাবু 'নায়ক' নামে দৈনিক-পত্রে 'ক্ষুদিরামের হাসি' ও 'কানাইএর বাঁশী' শীর্ষক যে দুইটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মভেদী ভাবোচ্ছ্বাসের ভাষা এখনও যেন কাণে ঝঙ্কার দিতেছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই সময়ে একটু অন্য রকম সুরে 'পথ ও পাথেয়,' 'সমস্যা,' 'সদুপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সময়-গুণে অনেকের নিকট তাহা 'বেসুরা' বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-রচিত "কবি হেমচন্দ্র" নামক গ্রন্থের একস্থানে আছে—"স্নান-ঘাটের পল্লী-যুবতী বুঝে না যে 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়'। বাটে লম্বা লাঠিতে গামছা-বাঁধা কত লোক চলিয়াছে—জানে না ভারত কাহাকে বলে।"—কিন্তু এ কথা এই নব জাগরণের যুগে অসত্যে পরিণত হইয়াছিল। তখন নিরক্ষর ভিখারীরা হাটে বাটে অশিক্ষিত কবির রচিত যে গান গাহিয়া বেড়াইত, তাহার কথা স্মরণ করিলে আমাদের উক্তি সত্য কিনা, পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। সে গানের স্থল-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"বিদায় দাও মা! একবার ঘুরে আসি!
* * *
মাটির বোমা তৈরী ক'রে, দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইন ধ'রে,—
লাট সাহেবকে মারবো ব'লে—মরলো ভারতবাসী!
* * *
হাতে যদি থাক্‌তো ছোরা,
তোর ক্ষুদি কি দিত ধরা?
ব'য়ে যেত রক্তের ধারা—
দেখ্‌তো ইংলণ্ডবাসী!
হাসি হাসি যাবো ফাঁসি—দেখ্‌বে ভারতবাসী।
মা, দশ মাস দশ দিন পরে ;
তোর ক্ষুদিরাম আস্‌বে ফিরে ;
চিন্‌তে যদি না পার মা—চিন্‌বে গলার ফাঁসি।"

গানটি স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিলাম, সুতরাং এক-আধটু ভুল থাকিতে পারে। যাহা হউক, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে,

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তখন ঘুমাইতেছিল বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ বাস্তবিকই জাগিয়া উঠিয়াছিল। এবং সেই জন্যই ভাঙ্গা বাঙ্গালা আবার জোড়া লাগিয়াছিল বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বঙ্গ-ভঙ্গ-ব্যাপারের পরিবর্ত্তনের পর বড়াল-কবি অক্ষয়কুমার অখন্ড বঙ্গমাতার যে বন্দনা-গীতি গাহিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিলামঃ—

"প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার!
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি—শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির-নেত্রে চাহি';
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।

জ্বলিছে কিরীট তব—নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী—
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল।
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

*　　*　　*

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা!
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।
সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা!
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে;
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্ত-রাগ তড়াগে তড়াগে।

মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দুখানি!
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ-ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখগ্লানি।
ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্রতলে,
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল!

* * *

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকীলতায় গেছে গিরিভূমি ভরি, ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ-ঘূৎকার
বহিছে উত্তর-বায়ু শিহরি' শিহরি'!

হেরি,—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে,
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী!
ভগ্ন স্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে,
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী।

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে!

এস, চণ্ডীদাস-গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি জয়দেব-ধ্বনি!
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-সুকৃতি,
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী!"

এই কবিতা-সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্গমাতার এই বন্দনা অতুল্য, সূত্রগ্রন্থ 'বন্দে মাতরমে'র উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক। পড়িতে পড়িতে আত্ম-গৌরবে আত্মহারা হইতে হয়; মনে হয়, এমন সুমাতার আমরা কেন কুপুত্র হইব?"

দেশবন্ধুর দেশ-প্রীতি

বড়াল-কবির ঐ বঙ্গ-বন্দনা ব্যর্থ হয় নাই। 'চণ্ডীদাস-গীতি' ও 'শ্রীচৈতন্য-প্রীতি'—যে মাটির গুণে যে মা-টির কোলে জন্মিয়াছে, সেই মায়ের মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতা-জ্ঞানে পূজা করিবার পুরোহিত পরে আমরা পাইয়াছিলাম। সে পুরোহিত আমাদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি নিজ-মুখেই বলিয়া গিয়াছেন,—"মেরেছ কলসীর কানা—তা বলে কি প্রেম দিব না? এই দুই ছত্র যখন মনে পড়ে, তখন মন এক রকম রসে উছলিয়া উঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার জন্ম সার্থক, আমি বাঙ্গালায় জন্মিয়াছি। বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে আর কোনও দেশের তুলনা হয় না। বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ ক'রে যে সভ্যতা ও culture দিয়ে গেছেন—তা আমার বিশ্বাস সব দেশকে নিতে হবে। গৌরাঙ্গের জীবন পাঠ ক'রে আমি প্রাণে একটা সাড়া পেয়েছিলাম। বর্ত্তমান কালের artificial life কিংবা artificial religion আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশকে বুঝতে হ'লে গৌরাঙ্গ ছাড়া বুঝা যায় না। গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব জীবন ও সাধনা এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী গান আমাকে নূতন আলো দেখাইয়াছে।"—এই 'নূতন আলো' কেবল তিনি নিজে দেখেন নাই—দেশবাসীর মনকে সেই আলোকে আলোকিত করিবার আশায় অতুল সুখ-সম্ভোগ, অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ সব পরিহার করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বলিয়া বেড়াইয়াছেন,—"দেশবাসীকে বলি—প্রথমে তোমার গৃহে অযত্নে উপেক্ষিত দীপ প্রজ্বলিত কর—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং অতীতের আলোকে তোমার বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি কর।"—আরও বলিয়াছিলেন,—"কোথায় বাঙ্গালার আত্মা, জাগরিত হও! বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল—এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল, আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচিব।" এমন মাতৃভাবে ডুবিয়া, মা-ময় হইয়া, বাঙ্গালীর প্রাণে বাঙ্গালার রূপ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও দেশ-নায়ককে করিতে দেখি নাই। চেষ্টা করা দূরে থাকুক, রামমোহন হইতে সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ইঁহারা কেহই বাঙ্গালা দেশকে ঠিকমত চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বরং বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে কতকটা ভুলিয়া ও

কতকটা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে বড় করিবার—বাঙ্গালীকে দেশহিতৈষী-রূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বারংবার বলিয়া গিয়াছেন,—"বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী না হইতে পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই।" "আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, সেই বাঙ্গালার প্রাণ-ধর্ম্ম ধীরে ধীরে কেমন লীলা-চঞ্চল স্রোতের মত চলিয়াছে। 'মাৎস্য ন্যায়ে'র অরাজকতার যুগে বাঙ্গালা যে গর্জ্জন করিয়াছিল, সে সুর বাঙ্গালা ভুলিয়া যায় নাই। আজ ফেরঙ্গ-যুগেও বাঙ্গালা সেই ধর্ম্মের আন্দোলন ভুলে নাই, কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে বাঙ্গালার স্বভাব-ধর্ম্ম, যে প্রাণ মূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই ঢাকা নগরোপান্তে সেই অদ্বৈত-বংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহন-বনে সেই প্রাণ-ধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলা-স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।"

এই প্রাণের আন্দোলনটুকু চিত্তরঞ্জন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রাণ-ধর্ম্মের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,—"আমার কাছে দেশসেবা ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণ নয়। সে আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, আমার জীবন। আমার দেশ-মাতৃকার মূর্ত্তির মধ্যে আমার ভগবান্‌ও জাগ্রত।" "দেশ বলিলে আমি ইষ্টদেবতাকেই বুঝি। পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জাতীয়তাকে বুঝিতে শিখি নাই। দেশকে সেবা করিলে মানব-সমাজকে সেবা করা হয়। আর মানব-সমাজের মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামগোপাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রের সকল কর্ম্মী, সকল কর্ম্ম-নায়কেরই মনের ভাব কতকটা এইরূপ ছিল যে, ইংরেজ যেমন পেট্রিয়ট, আমিও সেইরূপ পেট্রিয়ট হইব। দেশ-সেবা যে ধর্ম্মের অঙ্গ, এ কথা তাঁহাদের মনে কখনও উদিত হয় নাই! এই ভাবের উদ্বোধন সাহিত্য-ক্ষেত্রেই প্রথম দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রই এ ভাবের প্রথম ও প্রধান প্রবর্ত্তক। তারপর স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা এই ভাবের ভাবুক—এই ভাবের প্রচারক-রূপে অবতীর্ণ হইতে দেখি। তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—"হিন্দু রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও অন্যান্য যাহা কিছু

সবই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া নাহিলে বুঝিতে পারেন না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর; অন্যগুলি যেন তাহারই একটু উল্টা-পাল্টা মাত্র।"—তারপর, স্বদেশী যুগে অরবিন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের রচনায় ঐ ভাব-ধারারই মহা তরঙ্গ-লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পবিত্র ভাব-প্রবাহ সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ দেশনেতৃগণের প্রাণকে কখনও স্পর্শ করে নাই সত্য, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের চিত্ত তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার 'স্বরাজ-সাধনা' স্বদেশী যুগের লেখা। সে সময়ে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম-নায়ক-রূপে প্রকট হন নাই সত্য, কিন্তু দেশ-সেবা-কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন না। দেশকে তিনি সহসা ভাল বাসেন নাই,—অবসর মতও ভাল বাসিতেন না। তাঁহার কথাতেই তাঁহার দেশ-প্রীতির পরিচয় শুনুন,—"আমার বাঙ্গালাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্ত্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি। আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

তাঁহার 'মানস-মন্দিরে মাতৃভূমির মোহিনী-মূর্ত্তি' ঐরূপ জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই মনে হয় সুরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া তাঁহার জন্য দেশচর্য্যের পৌরোহিত্যের আসন ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এইখানে আমরা প্রকারান্তরে বঙ্কিম-প্রচারিত ভাব ও আদর্শেরই জয়-জয়কার দেখিতে পাই। চিত্তরঞ্জন ঠিক সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য নহেন,—বঙ্কিমচন্দ্রেরই ভাব-শিষ্য ছিলেন। কাজেই বলিতে হয়, সাহিত্য-গুরুর নিকট রাষ্ট্র-গুরুর পরিশেষে পরাজয়ই হইয়াছে।

দেশবন্ধুর মানস-মন্দিরে বাঙ্গালার যে রূপ জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, দেশবন্ধুর রচনা হইতে সেই রূপের বর্ণনাটুকু ও তাঁহার হৃদয়ের কামনাটুকু পাঠকগণকে এবার শুনাইয়া এ প্রস্তাব এইখানেই শেষ করিতে চাহি।

দেশবন্ধুর বঙ্গ-বন্দনা

"অতুলনীয়া বাঙ্গালা আমার—বাঙ্গালার কত মধুর রূপ! এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিধি এত রূপ কই আর ত কাহাকেও দেন নাই। আমার

বাঙ্গালার রূপের কি তুলনা আছে! শ্যামচেলাঞ্চলময়ী বনরাজি-বিভূষিতা সরিদ্‌বিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী মা'র বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণ-তলে উদ্দাম-উচ্ছল মহোর্ম্মি-বিস্ফুরিত সাগরের দিগন্ত-মুখরিত হল্‌-হলা, শিরে নাগাধিরাজ ধূর্জ্জটি, সূর্য্য-কিরণে ধক্‌ ধক্‌ জ্বলিতেছে। মা আমার এক হাতে ধান্যশীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেত-পদ্ম; আকাশ উজ্জ্বল, তরুণ রবি হিরণচূর্ণ দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে পাশে ললিত কণ্ঠে পিককুল কল-ঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে। এ রূপের কি তুলনা আছে!"

আর তাঁহার জীবনের সাধ ও কামনা সম্বন্ধে তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন,—"আমি বাঙ্গালী হইয়া জন্মিব মরিব—আবার জন্মিব—আবার মরিব—আমার আর অন্য সাধ-কামনা নাই।"

ভাষা-প্রীতি

এক

কেবল মাতৃভূমির মহিমা-কীর্ত্তন নয়—মাতৃভাষারও মহিমা-কীর্ত্তন আমরা ইংরেজের আমলে করিতে শিখিয়াছি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বে যেমন স্বজাতিবাৎসল্য- বা স্বদেশপ্রীতি-পরিচায়ক কোনও বাঙ্গালা রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না, তেমনি রামনিধি গুপ্তের পূর্ব্বে মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধক কোনও বাঙ্গালা রচনারও অস্তিত্ব দেখা যায় না। নিধুবাবুই সর্ব্বপ্রথম 'স্বদেশীয় ভাষা'র গুণ গান করিয়া স্বদেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা—
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা!
কত নদী-সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?"

ঈশ্বর গুপ্ত-রচিত 'মাতৃভাষা'শীর্ষক কবিতার 'মাতৃসম মাতৃভাষা' উক্তিকে উপলক্ষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন—"মাতৃসম মাতৃভাষা, সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? 'বাঙ্গালা বুঝিতে পারি'—এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত।"—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত বয়সে নিধু গুপ্তের চেয়ে প্রায় একাত্তর বৎসরের ছোট। সুতরাং নিধুবাবুর সময়ে বঙ্গভাষার অবস্থা যে আরও শোচনীয় ছিল, এ কথা সহজেই অনুমেয়। শুনিতে পাওয়া যায়, 'হিন্দুস্থানি খেয়াল ও টপ্পা' শিখিবার ও বন্ধুবর্গকে তাহা শুনাইবার সময়ে 'বিনে স্বদেশীয় ভাষা হৃদয়ের তৃষা যে ঘুচে' না, এ কথা নিধুবাবু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন; এবং সেই অনুভূতিরই ফলস্বরূপ বাঙ্গালা টপ্পা ও উপরি-উক্ত গানটি তাঁহার নিকট হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। নিধুবাবু তাঁহার 'গীতরত্ন' নামক পুস্তকের 'ভূমিকা'য় নিজেও লিখিয়া গিয়াছেন,—"এই পুস্তকান্তর্গত গীতসকল আপ্ত-বন্ধুগণের এবং গানে আমোদিত ব্যক্তিদিগের তুষ্টির কারণ রচনা করিয়াছিলাম।"—এই সব কথার উপর নির্ভর করিয়া যদি মনে করা

যায়, নিধুবাবু যৌবনে না হউক, অন্ততঃ মধ্য বয়সেও মাতৃভাষা-সম্বন্ধে ঐ মহিমমূলক গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, রামমোহন তখন নিতান্ত নাবালক ছিলেন, এবং মৃত্যুঞ্জয়ও বোধ হয় সে সময়ে সাহিত্য-আসরে অবতীর্ণ হন নাই। কারণ, ইঁহারা সকলেই নিধুবাবুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তাঁহার জন্মের প্রায় একুশ বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় ও তেত্রিশ বৎসর পরে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্তের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তবে এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, যদি কেহ মুদ্রিত পুস্তকের তারিখ দেখিয়া বঙ্গভাষা-প্রীতিমূলক রচনার প্রথম নিদর্শন খুঁজিতে যান, তাহা হইলে খুব সম্ভব নিধুবাবুর গানের পরিবর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয়ের লেখাই তাঁহার নজরে পড়িবে। 'গীতরত্ন' নামক যে গ্রন্থের ভিতর ঐ গান আমরা দেখিয়াছি, সে গ্রন্থ নিধুবাবু তাঁহার মৃত্যুর প্রায় বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে,—অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে যদিও তাঁহার গানের বই কেহ কেহ ছাপিয়াছিলেন, কিন্তু সে সব বই আমরা কখনও দেখি নাই। সুতরাং সে পুস্তকগুলির মধ্যে কোন্‌খানি কবে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তাহার ভিতর নিধুবাবুর ঐ গান ছিল কিনা, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নিধুবাবুর 'গীতরত্নে'র প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র 'মুখবন্ধে' আছে,—"অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা,—সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য হেতুক। যেমন দুই এক পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ হইতে বহুতর পণ্ডিতাধিষ্ঠিত দেশ উত্তম ইত্যনুমানে সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধচন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন।"—এই কয় ছত্র অবশ্য নিধুবাবুর কয় ছত্রের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বলেন,—"মৃত্যুঞ্জয় যে সময়ে অপোগণ্ড বঙ্গ গদ্যের লালন-পালন-ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্য সত্যই ভাষা পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকার মত অনাদৃতা, ধূল্যবলুণ্ঠিতা, বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মাণা, সংস্কৃত-পণ্ডিতমণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা। সেই সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত 'তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা' বলিয়া আদর

করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইলে এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পিঠে করিয়া মানুষ না করিলে, আজি এই সাগর-তরঙ্গের তেজধারিণী, অক্ষয়-ভূষণে ভূষিতা, হেম-ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম-ভঙ্গিমাশালিনী অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না।"

দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ই যে সর্ব্বপ্রথম "সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষা" বলিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু ঐ মন্তব্যের আদি প্রচারক তিনি কি না, এ বিষয় লইয়াও তর্ক উঠিতে পারে। 'অভিনব সাহেব জাতের শিক্ষার্থে' তিনি 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' লিখিলেও এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহার বাঙ্গালা লেখার প্রবৃত্তির মূলে যে কয় জন সাহেব উদ্যোগ ও উৎসাহের জল সেচন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে নিজের লিখিত— "A Grammar of the Bengalee Language" নামক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন— "It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. This idea is very far from correct; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe." * * * "The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India; for though it contains many words of Persian and Arabic origin, yet four fifths of the words in the language are pure Sungskrita. Words may be compounded with such facility, and to so great an extent in Bengalee, as to convey ideas with the utmost precision, a circumstance which adds much to its copiousness. On these, and many other

accounts, it may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East."—শুধু মুদ্রিত পুস্তকের তারিখ দেখিয়া বিচার করিতে গেলে পাদ্রী কেরী সাহেবের এই লেখাটিকেই অবশ্য বাঙ্গালা ভাষার প্রথম প্রশস্তি বলিয়া গণ্য করিতে হয় এবং বলিতে হয়, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় কতকটা পাদ্রী কেরীর বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের নিকষে কষিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্তও টেঁকসহি হয় না। কারণ, ইতিহাস বলে, 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইলেও রচিত হইয়াছিল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং যদি মনে করা যায় যে, কেরী সাহেবের মন্তব্যের উপর মৃত্যুঞ্জয়ের মন্তব্যের কিছু ছায়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে বোধ করি, তাহা তেমন কিছু অন্যায় বা অসঙ্গত হয় না।

ইঁহাদের পরই রামমোহনের যুগ। রামমোহন কার্য্যতঃ যদিও গৌড়ীয় ভাষা-প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃভাষার গুণ কীর্ত্তন করিয়া বা শিক্ষা-কার্য্যে তাহার উপযোগিতা বুঝাইয়া কখনও কিছু লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। এ হিসাবে বরং তাঁহার প্রতিপক্ষ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম কতকটা করিতে পারা যায়। গৌরীকান্তের রচনা-মধ্যে মাতৃভাষার প্রশংসাসূচক বাক্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া যে উচিত, এ কথা বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় তিনিই প্রথম বলিয়াছিলেন। তাঁহার "কর্ম্মাঞ্জন" নামক গ্রন্থ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"বালকাদির স্বদেশীয় ভাষাতে উপদেশ করা ও কৌশল দর্শান উচিত হয়, কেন না তাহাদিগের পৈতৃক ভাষা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। এবং যেমত যেমত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে তাহার মত নিজ ভাষার পারিপাট্যগ্রহ অথচ শিক্ষিত বিষয়ে নৈপুণ্য হইতে পারে। * * * যদ্যপি রাজার ভাষা ভাষাসকলের রাজা ও অর্থকরী বিদ্যা সর্ব্বজনমান্যা এবং তাহাতেই অনুরাগ অনেক হয়। তথাপি শিক্ষকের উচিত যে বালকাদির স্বদেশীয় বিদ্যা ও ধর্ম্মের মূল প্রথমতঃ উপদেশ করিয়া তাহাতে অধিকার জন্মান, তদনন্তর অর্থকরী বিদ্যা যে কোন ভাষাতে হউক না কেন তাহার শিক্ষা ও আমূল তাহার পারিপাট্য অভ্যাস করান। নতুবা ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ প্রায় হইয়া থাকে।"—ইহা ভারত-গভর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক-প্রবর্ত্তিত

শিক্ষা-পদ্ধতিরই কতকটা প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিক সাহেব এক বিজ্ঞাপন প্রচার-দ্বারা এই নিয়ম করেন যে, এ দেশের সমস্ত শিক্ষা-কার্য্যই ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত হইবে। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা উত্তরোত্তর উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলেন যে, এই সময়ে "সাধারণ লোকে ইংরাজী শিক্ষা করিবার আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল ; এমন বোধ হইতে লাগিল যে দেশীয় ভাষা বা একেবারে উৎসেধ দশা প্রাপ্ত হয়।"* এইরূপ ভয় যে গৌরীকান্তও তখন পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত "কর্ম্মাঞ্জন" পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ মাতৃভাষার এই মঙ্গলকামী লেখকটির নাম কখনও কাহাকেও করিতে দেখি না।

দুই

এইবার গুপ্ত-কবি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা বলিব। ঈশ্বরচন্দ্রের 'প্রভাকর' যেন সত্যই প্রভাকরের ন্যায় আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়া বাঙ্গালীর মনকে এক অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত করিয়াছিল। গৌরীকান্ত বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষা পড়িবার জন্য পরামর্শ দিলেও তাঁহার 'জ্ঞানাঞ্জন' ও 'কর্ম্মাঞ্জন', বৈকুণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকার উত্তর' ও 'ঈশ্বর সাকার' প্রভৃতি নীরস ভাষায় লিখিত দুরূহ বিষয়ক গ্রন্থসকল বাঙ্গালী পাঠকের মনে বোধ হয় বিভীষিকারই সঞ্চার করিয়াছিল। এমন সময়ে 'প্রভাকর'কে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের মন হইতে মাতৃভাষা-বিদ্বেষ দূর করিবার চেষ্টা না করিলে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, রঙ্গলাল প্রভৃতি কলেজীয় ছাত্রগণকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহের বিষয়। বাঙ্গালা ভাষার দুর্দ্দশা গুপ্ত-কবিকে কিরূপ ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা তাঁহার লিখিত এই কয় ছত্র পড়িলেই বুঝা যায়—

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।।
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা।।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ—১৭৭৮ শক।

নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা।।
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে।।" ইত্যাদি—

শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও বাঙ্গালীকে তিনি বুঝাইয়া বলেন,—"সম্প্রতি স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেশের উচ্চ গৌরব কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না। অধুনা আমরা অন্য কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিয়া দেশীয় মহাশয়দিগের কেবল দেশের ভাষার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অনুরোধ করিতেছি। কারণ, **ভাষাই সকল বিষয়ের মূলাধার, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শুদ্ধ ভাষার পরিচয়েই পরস্পর পরিচিত হইতেছি, সাংসারিক তাবৎ কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং এমত মহোপকারিণী যে জাতীয় ভাষা তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, তাহা কি কেহই বিবেচনা করেন না?** * * * আমাদিগের ভাষা অতি সুশ্রাব্য ও সুকোমল এবং মাধুর্য্য-রসে পরিপূরিতা। এই ভাষায় বাক্য দ্বারা ও লেখনী দ্বারা উত্তমরূপে নানা কৌশলে ও সহজে মনের অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করা যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত আন্তরিক দ্বেষ হইল কেন? কেবল আপনারা দ্বেষ করিলেও হানি ছিল না, যাঁহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়াও জ্ঞান করেন না। হায় কি আক্ষেপ! নব্য বেঙ্গাল বাবুসাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহংকার করেন, তাঁহারা দেশের ভাষার প্রতি কিরূপ যত্ন করেন, তাহা কি দেখিতে পান না? * * * কয়েকজন যুবা ব্যক্তি এ বৎসর টাউনহলে অতিশয় সদ্বক্তৃতাপূর্ব্বক বড় বড় ইংরাজদিগকে হতগর্ব্ব করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু বাবুসাহেবেরা যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গের দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নিমিত্ত বঙ্গভাষায় এইরূপ সুবক্তৃতা করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎ পক্ষে কি এক আশ্চর্য্য সুখের ব্যাপার হইত। ফলে তাহার চেষ্টা নাই, বাঙ্গালা দুইটি কথা এক করিয়া কহিতে হইলে মাথায় অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতি সম্ভ্রান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি যিনি ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত নহেন, অথচ জাতীয়

ভাষায় অতি নিপুণ, তাঁহার সহিত কোন ইয়ং বেঙ্গালের সাক্ষাৎ হইলে কথোপকথনকালীন শুনিতে বড় কৌতুক হয়। যথা,—'কেমন ভাই, বাড়ীর সকল মঙ্গল তো,—মশয়, আসুন, লাষ্ট নাইটে বড় ডেঞ্জরে পড়েছি, আঙ্কেলের কলেরা হয়েছে, পলস্ বড় উইক হোয়েছিল, আজ মর্ণিংয়ে ডাক্তার এসে অনেক রিকভার করেছে, এখন লাইফের হোপ্ হয়েছে।'—সে ভাল মানুষ—বাবুজির উত্তর শুনিয়া ভাল-মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না। ভ্যা-ভ্যা রামের ন্যায় অবাক্ হইয়া খাড়া থাকে। এইরূপ কত আছে, যাহা লিখিতে লেখনীর মুখে হাস্য আইসে।"—মাতৃভাষার অনাদরে এমন মর্ম্মভেদী আক্ষেপ ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই, পরেও যে ইহার চেয়ে বেশী কিছু কেহ বলিতে পারিয়াছেন, এমন মনে করি না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এখানে সকলের জানিয়া রাখা ভাল,—ঈশ্বর গুপ্ত সেকালের 'নব্য বেঙ্গাল বাবু সাহেবদিগের' কথোপকথনের ভাষার হাস্যকর নমুনা দিয়া তাঁহাদিগকে যে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহারই একটি চিত্র পরে আমরা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটকে'র এক দৃশ্যে দেখিতে পাই। ১২৭৩ সালে এই নাটক লিখিত হয়। তাহার 'তৃতীয় অঙ্কে'র প্রথমেই আছে—

"গ্রাম্য। কে হে নাগর না কি?
নাগর। (দেখিয়া) হেল্লো, গুড্ মর্নিং। (আনন্দে করস্পর্শ)
গ্রাম্য। তবে এখন তোমার সে পীড়াটা সেরেছে?
নাগর। হাঁ, এখন আমার হেল্থ মচ্ ইম্প্রুব্ড্ বটে, কিন্তু অনেকদিন এবার কলিকাতায় ছিলেম, টৌনের ভিতরটা নাকি বড় ডার্টি—তাতে তত ষ্ট্রং ষ্ট্রং ফিল্ কচ্চিনে। তা ভাই, তুমি একটু ওয়েট্ কর, আমার একটি ফ্রেণ্ড্ আস্‌বে, দেখি, আস্‌চে কি না!
(পশ্চাদ্বর্ত্তনে প্রস্থান)

গ্রাম্য। (স্বগত) হরি বোল হরি! ও'র সে পীড়া সাল্যে কি হবে? মাতৃভাষায় অরুচি, এই একটি মহৎ পীড়ান্তর উপস্থিত। আর ও'দেরও তত দোষ নাই, এখন এমন সময় হ'য়ে উঠেছে, যারা ইংরাজি ছোঁয়নি, তারাও অন্ততঃ দু-চারটে অশুদ্ধ ইংরেজি কথা কয়ে বসে"—ইত্যাদি—

বলিতে লজ্জা বোধ হয় যে, এই 'মাতৃভাষায় অরুচি'-রোগ এতকাল পরে—এই ঘোর স্বাদেশিকতার যুগেও আমাদের মন হইতে তেমন বেশী বিদূরিত হয় নাই।

যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্ত শুধু জন্মভূমিকে 'জননী' বলিতে নয়, স্বদেশীয় ভাষাকেও 'জননী' মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিতে বাঙ্গালীকে যে প্রথম শিখাইয়াছিলেন, এ কথা বাঙ্গালী আজ ভুলিয়া গেলেও বাঙ্গালীজাতির পক্ষে উহা সবিশেষ স্মরণযোগ্য বলিয়া মনে করি। তাঁহার 'মাতৃভাষা'-শীর্ষক কবিতার শেষ কয়টি ছত্র এই—

"যে ভাষায় হ'য়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত
বৃদ্ধকালে গান কর সুখে।
মাতৃ-সম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।।"

নিধু গুপ্তের "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা—বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা" গানের পর ঈশ্বর গুপ্তের ঐ কবিতাকেই বঙ্গভাষার প্রকৃত বন্দনা বলা যাইতে পারে। 'মাতৃভাষা' কথাটা ঈশ্বর গুপ্তের লেখাতেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই। এবং মাতৃভাষা যে মাতৃ-সম গরীয়সী, এ কথাও তাঁহার নিকট আমরা প্রথম শিখিয়াছি।

মাতৃভাষার দুর্গতিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাণে যে দুঃখানুভূতি জাগে এবং সেই দুঃখোপশান্তির চেষ্টায় তাঁহার মনে যে ভাবের উদ্বোধন হয়, তাহার পরিচয় তাঁহার 'প্রভাকর' পত্রে আরও অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের আর প্রয়োজন দেখি না। উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

ভাষা-জননীর প্রতি দেশের লোকের ভক্তি ও ভালবাসা না জন্মিলে দেশের উন্নতি যে সম্ভবপর নহে, এ কথা বাঙ্গালীকে বুঝাইবার জন্য 'প্রভাকরে'র ন্যায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাও পরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৭৭০ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' লিখিয়াছিলেন,—"এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? * * * ইহা সত্য যে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং

বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? * * * ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে, আমারদিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লানবদনে কহিয়া থাকেন যে,—"সেই বাঞ্ছিত কাল কোন্ দিন আগমন করিবে, যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে। * * * যাহা হউক, এ সকল ব্যবহার জন্মভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে। যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ-মিশ্রিত যত্ন-দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য-ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগী মিত্র-দিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, * * * সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? * * * এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী-পর্ব্বত-মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতি-পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধ-স্ফুট মধুর বাক্য-ভাষণে মাতা-পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য-স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন্য-দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। * * * আমারদিগের দেশ-ভাষা যে এমত সুললিত হইবে, ইহা সম্যক্ সম্ভব; কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ-প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।"—ইহা খুব সম্ভব অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা। দেশের লোকের মনে মাতৃভাষার মহিমা-বোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যেই উহা রচিত। ঈশ্বর গুপ্তের রচনার সহিত এই রচনার বেশ একটু ভাবগত যোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

তিন

'সধবার একাদশী'র একস্থানে নিমচাঁদ বলিয়াছে,— "I read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English বাবা!"—ইহা

কেবল রঙ্গ জমাইবার জন্য 'রংদার বুলি' মাত্র নয়। প্রহসনের কথায় ও ঘটনায় অনেক সময় আত্যন্তিকতা থাকে, এবং সেটা প্রহসনের পক্ষে প্রায় দোষের না হইয়া গুণের বা কৌশলের পরিচায়ক হয়; কিন্তু নিমচাঁদের ঐ উক্তিতে সে আত্যন্তিকতা নাই। উহার সবটুকুই সত্য। শুনিতে পাই, রেভারেন্ড্ লালবিহারী দে তাঁহার শিষ্যবর্গকে ইংরাজী ভাষায় শুধু লিখিতে ও বলিতে নয়,—স্বপ্ন দেখিতেও উপদেশ দিতেন। লালবিহারী ও রাজনারায়ণ বসু ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ তাঁহার 'সেকাল আর একাল'-নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না। আমাদের যিনি পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার সঙ্গে আমরা কেবল গল্প করে সময় কাটিয়ে দিতাম। সুতরাং যখন আমরা কলেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল। আমাদিগের সময়ের কলেজের প্রথম শ্রেণীর একটি ছাত্রকে একদিন কলেজে যাইবার সময় রাস্তায় একজন সামান্য লোক একটি বাঙ্গালা লেখা পড়িয়া তাহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইতে অনুরোধ করে। তিনি সে লেখাটি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার এতদূর লজ্জা উপস্থিত হইল যে ললাটে স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কাগজ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—"বাবু! এ ইঁডিবিডি করা নয়, বাঙ্গালার ঘানি।" একবার এই সময়ের শিক্ষিত আমার একটি বন্ধু বয়স্ক অবস্থায় আমার বাসায় একদিন আসিয়া বলিলেন—"আজ একটা বড় শুভ সমাচার শুনিলাম।" আমরা আস্তে ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি সমাচার?" তিনি বলিলেন,—"সোমপ্রকাশাদি সম্বাদপত্রে না কি আন্দোলন হচ্ছে যে তিনটা 'স' উঠে গিয়ে একটা 'স' হবে, তা' হ'লেই আমার বাঙ্গালা লেখার সুবিধা হবে।" তিনি একবার এক সভায় 'অভিনন্দন পত্র' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রঘুনন্দন পত্র' বলে ফেলেছিলেন।"—এইরূপ হাস্যকর শব্দ-বদল-বিভ্রাট আমরাও যে কিছু না শুনিয়াছি, এমন নহে।

মনে পড়ে, হেমচন্দ্রের শোক-সভায় 'ইণ্ডিয়ান্ মিরারে'র সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন 'বৃত্রসংহার'কে 'বেত্রসিংহ' বলিয়াছিলেন; প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীঘাটের এক সভায় দেশপূজ্য

সুরেন্দ্রনাথ 'মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী' বলিতে গিয়া 'মা দুর্গে দুর্গেশনন্দিনী' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা এখনকার কালে সেকালের কথা বলিয়া বিবেচিত হইলেও রাজনারায়ণ-কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট 'একালে'র চেয়ে উহা আরও অনেক বেশী একালের কথা। উহাকে কতকটা নিমচাঁদী মনোভাবেরই জের বলা যাইতে পারে। রাজনারায়ণের সময়েই বঙ্গদেশে নিমচাঁদ-দলের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাঁহারা শুধু বাঙ্গালা ভাষাকে ভুলিতে নয়—ঘৃণা করিতেও শিখিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের সহপাঠী ভূদেব তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধে'র একস্থানে লিখিয়াছেন,—"বর্ষ কতিপয় গত হইল, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ দুই প্রকার লোকই উপস্থিত ছিলেন। একজন সভাসদ প্রস্তাব করিলেন—'সভার কার্য্য-বিবরণ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হউক।' অমনি একজন 'কৃতবিদ্য' গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য-সহকারে ঐ কথার প্রতিবাদপূর্ব্বক ইংরাজীতে বলিলেন,—'বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার প্রবৃত্ত করিলে, দেশটী দুই সহস্র বর্ষ পাছু হইয়া যাইবে।'—ভাবিলাম, এখনকার দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সন্নিহিত সময়—সে সময়ে পঁহুছিলে দেশটী পাছু যায়, না আগু হয়? কৃতবিদ্য মহাশয়ের অগ্র-পশ্চাৎ-বোধটি বড় সুপরিস্ফুট হয় নাই।"

রাজনারায়ণের আর এক সহপাঠী বন্ধু—যাঁহার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত এক পত্রের একস্থানে আছে,—"Believe me, my dear friend, our Bengali is a very beautiful language. It only wants men of genius to polish it up; such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it,"—সেই মহাকবি মধুসূদনও যৌবনে মাতৃভাষাকে ভুলিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের জন্য ইংরাজী ভাষায় রোদন করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"And Oh! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land!"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন,—"সধবার একাদশীতে মধু দত্ত বা নিমে দত্ত

একজন পাত্র বা *Dramatis Personæ.* * * * উহার অনেক কথাই মাইকেলের।"

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ দুর্দ্দশার সময় শুধু ঈশ্বর গুপ্ত, গৌরীকান্ত ও অক্ষয় দত্ত নয়, দুই-চারিজন সহৃদয় সাহেবও বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তখনকার শিক্ষা-সমাজের সভাপতি কামেরণ সাহেব ছাত্রদিগকে বলেন,— " Placed as you are between the learning of Europe and the mass of your countrymen, you may make yourselves their benefactors to an incalculable extent, by interpreting to them, in your vernacular tongue, what you have learnt in English."

কামেরণ সাহেবের নামের সঙ্গে তখনকার ডেপুটি গবর্ণর স্যর হার্বাট্ ম্যাডক্ ও সদাশয় বিটন—এই দুই সাহেবের নামও উল্লেখযোগ্য। ছাত্রদিগকে পারিতোষিক-বিতরণের এক সভায় সভাপতি হইয়া ম্যাডক্ সাহেব বলেন,— " I should impress on the students of all our Scholastic Institutions the vast importance to themselves and their countrymen of their acquiring a thorough knowledge of the native languages, * * * Before I leave India I shall request the Council of Education to accept a gold medal to be presented next year to the writer of the best essay in the Bengali language on such subject as may be selected." আর বিটন সাহেব-সম্বন্ধে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 'তত্ত্ববোধিনী'তে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন,—"তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরস্থ কলেজের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক-বিতরণ-উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন—কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাই তোমাদিগের যশঃ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাঁহাদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি যে যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি-লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে, তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে

অথবা ইংরাজী গ্রন্থের উত্তম উত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে স্থায়িতঃ কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।”

আনন্দের বিষয়, এই সকল উপদেশ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ব্যর্থ যে হয় নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ স্বয়ং রাজনারায়ণ। “যখন আমরা কলেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই”—বলিয়া যিনি নিজেদের অতীত জীবন-কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৪৯ বা ’৫০ খৃষ্টাব্দে হেয়ার সাহেবের স্মৃতি-সভায় বক্তৃতা-কালে বলেন,—“আমাদিগের এই বঙ্গভূমিতে এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী ভাষাতে প্রসিদ্ধ কাব্যকাররূপে গণ্য হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তির আর সীমা নাই। তাঁহারা যাহা কখন হয় নাই, যাহা হইবার নহে, তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। * * * ঐ সকল যুবকেরা যদ্যপি এই কথা বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষা অতি অসম্পন্ন হীন ভাষা, তাহাতে রচনা করা দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে সিসিরোর সময়ের লাটিন ভাষার ন্যায় কিম্বা লেসিঙ্গের সময়ের জর্ম্মন ভাষার ন্যায় কি আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা অসম্পন্ন? আপনাদিগের নিজ নিজ দেশীয় ভাষা উন্নত করিয়া ঐ দুই মহাত্মা কি পর্য্যন্ত না যশস্বী হইয়াছেন, যদ্যপি আমাদিগের আত্ম-ভাষার উন্নতি-সাধনে আমরা যত্নবান হই, তবে ঐরূপ যশস্বী আমরাও হইতে পারি। আহা! বাঙ্গালা ভাষার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি উল্লিখিত যুবকদিগের হৃদয়ে কি কিছুমাত্র কারুণ্য সঞ্চার হয় না? তাঁহারা কেমন হৃদয় ধারণ করেন, তাঁহারাই জানেন” ইত্যাদি।—রাজনারায়ণের এই আন্তরিক আবেদন তখনকার দিনে কতগুলি ‘কৃতবিদ্য যুবকে’র অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, বলিতে পারি না; তবে সেই সময়ে হিন্দু কলেজের আরও জনকয়েক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র যে মাতৃভাষার অনুশীলনে আত্ম-নিয়োগ করিয়া বিটন সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়াছিলেন—যশঃ অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির নাম করিতে পারি। রাজনারায়ণের নাম আগেই করিয়াছি।

দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী'র জন্ম হয়। তাঁহার 'পত্রাবলী'তে দেখা যায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে লিখিয়াছিলেন,—"তুমি চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পার। ইংরাজি ভাষার ঠন্‌ঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি দেওয়াতে বিস্তর হানির সম্ভাবনা।" ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার হিন্দু কলেজের সহপাঠী রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক কাগজ বাহির করেন। এই মাসিক-মারফতে বাঙ্গালী মেয়েদের বাঙ্গালা পড়াইবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেক সংখ্যায় লেখা থাকিত—"ইহা চলিত ভাষায় লেখা, স্ত্রীলোকদের জন্যই লেখা, পণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন—পড়িতে পারেন, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য লেখা নহে।"

এই প্রসঙ্গে নীলমণি বসাকেরও নাম করা উচিত। তাঁহার 'নবনারী' প্যারীচাঁদের 'মাসিক পত্রিকা'-প্রকাশের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার 'বিজ্ঞাপনে'র একস্থানে গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"সমুদয় বালক-বালিকার ও সর্ব্বসাধারণের সহজে বোধ হইবার নিমিত্ত এই পুস্তক অতি সরল ভাষাতে লিখিত হইল।"—প্রসঙ্গক্রমে এখানে নীলমণির নাম করিলেও মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আরও দুই জনের সম্বন্ধে কিছু বলা এখনও বাকী আছে। রাজনারায়ণ যেমন মাতৃভাষা-অনুশীলনের উপকারিতা বুঝাইবার জন্য সভায় সভায় বক্তৃতা দিতেন ও প্রবন্ধ পড়িতেন, তাঁহার সহপাঠী ভূদেব ও মধুসূদন তেমন কাজ কিছু না করিলেও মাতৃভাষার উদ্দেশে যে ভাষার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও শ্রদ্ধার সৌরভে পূর্ণ। মধুসূদন অনুতপ্ত হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন,—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা' সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি',
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে, ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি'!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায় মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি' ;—

কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুল-লক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি ;
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি' ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।।"

তারপর ভূদেবের লেখায় আমরা দেখিতে পাই,—"পিতৃ-মাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণে ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের ত্রুটি হয়। এইজন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যূন হইয়া থাকে। মনুষ্য-শিশুর পক্ষে পিতা মাতা যাহা, মনুষ্য-সমাজের পক্ষে ধর্ম্ম এবং ভাষাও তাহা। **ধর্ম্ম সমাজের পিতা, ধর্ম্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়।**"—ইহা অতি মূল্যবান্ বাক্য।

এই যুগে শুধু হিন্দু কলেজের নয়,—সংস্কৃত কলেজেরও একদল ছাত্র মাতৃভাষার পুষ্টি-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তারাশঙ্কর তর্করত্ন বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা তখনকার দিনে অনেক লেখকেরই আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল। তবে ইঁহাদের কাঁহারও রচনার মধ্যে বঙ্গভাষার প্রতি কোনও প্রীতিমূলক বাক্য বা উচ্ছ্বাস দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

এই সময়ে গুপ্ত-কবির শিষ্য-দলেরও অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে দ্বারকানাথ অধিকারীই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম গুরুর ন্যায় বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'সুধীরঞ্জন' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে 'বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজি ভাষার কথোপকথন' নামে যে একটি কবিতা আছে, তাহার একস্থলে বঙ্গভাষার মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন,—

"বঙ্গদেশে বাস করি বার মাস,
বাঙ্গালীর মাতৃভাষা।
যতেক তোমার দোভাষি কুমার,
তাদের দেখিতে আসা।।

শুনি, সুতগণে, হেরিয়া নয়নে,
তোমার মোহিনী বেশ।
অলংকার আশে, থাকে তব পাশে,
আমার কপালে দ্বেষ।।
মরি মন-দুখে, সদা কাল মুখে,
বিজাতীয় দেশভাষ।
কভু কি স্বপনে, এইরূপ মনে
ভাবনা করে না বাস।।
জননী জঠর, ছাড়িয়া কঠোর,
ভূমিতে পড়িল যবে।
কি বোল বলিয়া, কোলেতে তুলিয়া,
সোহাগ করিল সবে।।
দিন দিন পরে, আধ আধ স্বরে,
কে শিখালে মা মা বুলি।
কে বলিল হাসি, দিদি দাদা মাসী,
সুধামাখা স্বর তুলি।।
পুত্র-আচরণ, করিলে স্মরণ,
মরণ-বাসনা হয়।
তারা কি না ছলে, সবাকারে বলে,
বঙ্গভাষা—ভাষা নয়।।

* * *

স্বদেশীয় ভাষ, শিখিতে উল্লাস,
না হয় অন্তরে যার।
বিধাতার ভুলে, মানবের কুলে,
জনম হয়েছে তার।।”

বঙ্গভাষার জন্য এই যে দুঃখ—ইহার প্রতিধ্বনি আমরা ‘সুধীরঞ্জন’-প্রকাশের প্রায় পনেরো বৎসর পরে আর এক কবির লেখায় শুনিতে পাই। ঢাকার কবি হরিশচন্দ্র মিত্র গুপ্ত-কবির সাক্ষাৎ-শিষ্য না হইলেও তাঁহার রচনায় গুপ্ত-কবির কিছু প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, তাঁহার ‘মিত্র প্রকাশ’ নামক যে মাসিক পত্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে বাহির হয়, সেই প্রথম সংখ্যার কাগজেই তিনি ‘মাতৃভাষা উপেক্ষিদলের প্রতি’ নাম

দিয়া তীব্র ভাষায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধের অল্প অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—"এক্ষণে অনেকগুলি লোকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গসাহিত্য-সংসার নিতান্ত সংকীর্ণ, ইহাতে প্রশস্তচেতা উন্নত ব্যক্তিদিগের বিচরণ বৃথা কালহরণ মাত্র। যে সকল পুস্তক সাহিত্য নামে পরিচিত, তত্তাবতের পাঠ বা অনুশীলনে আশানুরূপ ফল-লাভের সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ এই ভাষার সাহিত্যগুলিকে বাল্য-ক্রীড়ার খেলনক-তুল্য অন্তঃসারশূন্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অন্যান্য শ্রেণীর লোকে যেরূপই বলুক না কেন, ক্ষোভের বিষয় এই যে, যাঁহাদিগের অনুশীলনে ইহার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া সারবত্তার সংস্থান হইতে থাকিবে, সেই আশার স্থল বঙ্গজ কৃতবিদ্যদিগের অনেকের রসনাই, ইহার অযশঃ ঘোষণা করিয়া থাকে। * * * ইহা অস্বীকার্য্য নহে যে সংস্কৃত এবং ইংলণ্ডীয় ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষা সম্পূর্ণ নহে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারও উক্তোভয় সাহিত্য-সংসারের ন্যায় সম্যক্ সুসজ্জিত নহে, কিন্তু এই কারণেই কি বঙ্গ-সন্তানগণের বঙ্গভাষার এবং বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে? জননী কাহার উপর আত্ম-গৌরব-বর্দ্ধনের আশা করেন? জননীর অভাব-অপ্রতুল কাহার পূরণ করা কর্ত্তব্য? সুবোধ সুশিক্ষিত সন্তানেরা কি এতদ্বিষয়ে অগ্রগণ্য রূপে দায়ী নহেন? জননীর ধন-সম্পত্তির অল্পতা দেখিয়া যে সকল সন্তান তদীয় সেবা-শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া বসে, সাধু সমাজ তাদৃশ সন্তানদিগকে কি 'কুপুত্র' উপাধি-দ্বারা সম্বোধন করেন না? আমাদিগকে বঙ্গ-সন্তানগণ মাতৃভাষার সেবায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কি এই নিতান্ত ঘৃণিত বিশেষণ-দ্বারা সম্বোধিত হইতেছেন না?"

চার

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলিব। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষা পড়াইবার ও লিখাইবার জন্য এত কাল ধরিয়া যে প্রয়াস ও উদ্যম চলিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই প্রভাবে আত্ম-চিত্ত সংগঠিত করিয়া পরে সেই প্রয়াস ও উদ্যমকে জ্বলন্তরূপে প্রকাশ করেন। "মাতৃসম মাতৃভাষা"—গুরু-দত্ত এই মন্ত্রে তিনি স্বয়ং দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং পরে তাঁহার 'বঙ্গদর্শন'-সহায়ে সেই মন্ত্রে বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীকেও দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

'আলালের ঘরের দুলালে'র 'ভূমিকা'য় স্বয়ং গ্রন্থকার প্যারীচাঁদ বলিয়াছিলেন,—"অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে, সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল।" বঙ্কিমচন্দ্রও মনে হয়, ঐ উদ্দেশ্য লইয়া প্রথমে উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন। একে একে তিনখানি উপন্যাস লিখিবার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিয়া তাহার 'পত্র-সূচনা'য় নানা কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া বলেন যে, 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য।' তিনি লিখিয়াছিলেন,— "লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চর, এড্রেস্, প্রোসিডিংস্ সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়; কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। * * * আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব।" * * "নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচকসম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

"এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয় জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমন মনে করেন যে, সুশিক্ষিত-দিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক

ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্ কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন্ কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না।" * * * "এইরূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই, বাঙ্গালীর অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ। আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব। যত্ন করিব, এই মাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনকে 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী' করিবার জন্য যে যত্ন করিয়াছিলেন এবং সে 'যত্নের সফলতা' যাহা হইয়াছিল, তাহার তুলনা হয় না। এ অতুল্য সাফল্য-লাভের কথা এ যুগের অনেকের নিকট হয়ত অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু ইহা উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি নহে—অতিরঞ্জন নহে। বঙ্গদর্শনের সৃষ্টি যাঁহাদের সম্মুখে হইয়াছিল, তাঁহাদেরই সাক্ষাৎ-দর্শনের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রায় বার বৎসর পরে অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবন' প্রকাশিত হয়। তাহার 'সূচনা'য় প্রকারান্তরে ঐ কথাই স্বীকৃত ও ঘোষিত হইয়াছে। এই রচনার একস্থানে আছে—"বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালী-জীবনে ও বঙ্গসাহিত্যে আবার যুগ-প্রলয় হইল।" অক্ষয়চন্দ্রের পরম বন্ধু চন্দ্রনাথ বসু বলিয়া গিয়াছেন—"বঙ্গদর্শন পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে পারা যায়।" ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বঙ্কিম-স্মৃতি"তে বঙ্গদর্শন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমবাবু বঙ্গ-দর্শনে বাঙ্গালা ভাষার বিবিধ শক্তির বিকাশ অথবা বাঙ্গালা ভাষার শরীরে,—শিরায়, শোণিতে, মস্তকে, পূর্ব্ব-অপরিচিত বিবিধ শক্তির সঞ্চার করিতেছেন। বঙ্কিম-প্রতিভার নানা দিক্-প্রসারিণী শক্তি বঙ্গদর্শনে প্রতিবিম্বিত প্রতিভাত হইয়া লোককে বিস্মিত ও বিমোহিত করিতেছিল।" * * * "সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমবাবু যাহা বলিতেছেন ভাল, তাহাই ভাল, তাহাই সুন্দর; যাহা বলিতেছেন মন্দ, তাহাই

কুৎসিত, তাহাই কদর্য্য। রুচি-রাজ্যে এরূপ সিংহ-প্রতাপ বঙ্গদেশে, বোধ হয়, আর কেহ কখনও প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, পারিবেন না। একদিন 'এডিন্‌বরা রিবিউ' বিলাতে যাহা করিয়াছিল, একদিন বঙ্গদর্শন বাঙ্গালায় তাহা করিয়া গিয়াছে।" এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যও অতি মূল্যবান। তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি— "বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল।" * * * "বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে, তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাঙ্গালাভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে।"—বঙ্গদর্শনের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে এই ধরণের বিবৃতি আগেকার লেখকদের মধ্যে আরও অনেকের আছে। কিন্তু দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের দ্বারা প্রবন্ধকে অধিক ভারাক্রান্ত করিবার এখানে প্রয়োজন দেখি না।

বঙ্গদর্শন-প্রকাশের প্রায় সম-সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিত বীম্‌স্‌ সাহেব বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি যে প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও উপেক্ষার যোগ্য নহে। তাঁহার দ্বারা "বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ" নামে বঙ্গভাষায় লিখিত যে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র এই সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার প্রথমাংশেই আছে—"ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে। পৌরাণিক ইতিহাসের বারম্বার অনুকরণ এবং সামান্য শিশুবোধ অথবা অশ্লীল উপন্যাস পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালীরা এক্ষণে গদ্য কাব্য, নাটক, দেশ-পর্য্যটন বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদ্য-কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছেন। অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"—বীম্‌স্‌ সাহেব কৃত প্রায় আশি বৎসর পূর্ব্বেকার এই প্রস্তাব আজিকার দিনেও বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর গুপ্তের কথা বলিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে।

ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি।"—বলিলে অদৌ অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গভাষা-স্রোতস্বতী আজ বহুপথগামিনী। বঙ্কিমের ন্যায় 'ক্ষুদ্র লেখকেরা' ইহার বর্ত্তমান আবর্ত্ত-লীলা দেখিলে কি বলিতেন, জনি না ; তবে অনেক পাঠকের যে এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তাহা জানি। সেইজন্য বীম্‌স্‌ সাহেবের "বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদনে"র প্রস্তাবকে এ সময়ে সকলকে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

যে বৎসর বঙ্গদর্শনের উদয়, সেই বৎসরে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার উৎপত্তি। এই যুগে একটা কথা উঠিয়াছিল—'দীনা বঙ্গভাষায় প্রকৃত নাটক রচনা হইতে পারে না।' গিরিশচন্দ্র তখন বাঙ্গালা দেশে নট-নায়করূপে বিখ্যাত। তিনি মাতৃভাষার দীনতার কথা স্বীকার করিতেন না—সহ্য করিতেও পারিতেন না। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, সেই সময়ে তিনি ঐ উক্তির প্রত্যুত্তরে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে কবিতার প্রথমাংশটুকু তিনি স্মরণ করিয়া বলিতে পারিলেন না—শেষাংশের যেটুকু তাঁহার মনে ছিল, তাহাই আবৃত্তি করিলেন—

"দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার,
কোন্‌ ভাষে বাক্য-ভাবে হেন সংযোজন?

মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমল-কলি,
কোন্‌ ভাষে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে?
কালের করাল হাসি, দলকে দামিনী রাশি,
নিবিড় জলদ-জাল ঢাকে বা অম্বরে?"

গিরিশচন্দ্র বাক্যে যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাট্য-সাহিত্যেই নাটকীয় ভাষার প্রকৃত রূপ প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। ইহা আমাদের মন-গড়া কথা নহে। সেকালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই দুই সাহিত্য-রথী-কর্ত্তৃকও এই ভাষা অভিনন্দিত হইয়াছিল। 'সাধারণী'তে অক্ষয়চন্দ্র স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছিলেন—"এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।"

পাঁচ

মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পদ্যে তেমন কিছু লেখেন নাই বটে, তবে গদ্যে তিনি অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর শিক্ষা-ব্যাপারে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলনের উপযোগিতা ও উপকারিতার কথা দেশবাসীকে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়াছিলেন, তেমনটি আর কাহাকেও করিতে দেখি নাই। ১২৯৯ সালের 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করেন, এবং সে আলোচনা পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, স্যর গুরুদাস ও আনন্দমোহন বসু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সব আলোচনার মধ্য হইতে সামান্যাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এখনও যে সব শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বেকার এই লেখাটুকু একটু মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে উপকৃত হইবেনঃ—

"আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনি বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায়, অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্ত্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্ব্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্য্যাদা জান! ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার মর্ম্ম কি কখনও বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, আমি যখন মিল, স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাশ করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবা পুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্য-সাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল, আমার ইঙ্গিত-মাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালা লিখি, ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালার সৌভাগ্য কি হইতে পারে?"

* * * *

"বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া এমন সকল ভাল ছেলের সমাদর করে না এবং ভাল ছেলেরাও রাগ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না। * * * বাঙ্গালা তাঁহারা জানেন না, সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন—"বাঙ্গালায় কি কোন ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মত শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে!"—প্রকৃত কথা, আঙ্গুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা, আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।"—এই লেখাটুকুর মধ্যে 'সুকুমারী সুকোমলা তরুণী বঙ্গভাষা'র যে রূপ-বর্ণনা আছে, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

বঙ্গভাষায় মাতৃভূমি-বিষয়ক গান ও কবিতা যেমন প্রচুর আছে—সে তুলনায় মাতৃভাষা-সম্বন্ধে গান ও কবিতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিতে হইবে। ১৩০১ সালের ২৫ এ চৈত্র 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে'র 'প্রথম বার্ষিক উৎসব' হয়। এই উৎসব-উপলক্ষে মনোমোহন বসু ও গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ঈশ্বর গুপ্তের এই দুই সাহিত্য-শিষ্য কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। এই দুই লেখক রচিত মাতৃভাষার জয়-ঘোষণামূলক দুইটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। মনোমোহন লিখিয়াছিলেন—

"আর কেন দীনা হীনা শ্রীহীনা মলিনা বেশে—
তাপিতা মা মাতৃভাষা—ব্যথিতা যেন কি ক্লেশে?
কবিতা-কাননে পশি, সঙ্গীত-কমলে বসি,
চিরদিন মুখ-শশী, ফুল্ল ছিল নব রসে।
সভ্য-জগত-বাসিনী, মা তব সব ভগিনী,
শুনায়ে বিজ্ঞান-বাণী, হাসে সদা উপহাসে।
তাই কি নত বদনে, জানাতেছ পুত্রগণে—
বিবিধ জ্ঞান-রতনে, ভূষিতে তব উরসে?
হ'তেছে মা সে সাধনা, পূরিবে মনোবাসনা—
সর্ব্ববিদ্যা-বিভূষণা, হবে মা অল্প দিবসে।
দেখ মা সুষমা আজি, বঙ্গ-বুধ-রত্ন রাজি,
নানা জ্ঞান-রত্নে সাজি, মিলিত সেই শুভোদ্দেশে।"

গোপালচন্দ্রের সঙ্গীতে 'স্বদেশী ভাষা'র আদি স্তুতি-গীতির প্রতিধ্বনি থাকিলেও তাহা মর্ম্মস্পর্শী। সে গানটি এইঃ—

"মহোৎসবে আজি সবে, বঙ্গবাসী এস ভাই!
প্রাণভরে, সমস্বরে, মাতৃভাষার জয় গাই।
অনন্ত মহাসাগর, নদ, নদী, সরোবর,
গিরি-শিখরে নির্ঝর, কত শত দেখ্‌তে পাই।
যথা সে চাতকদলে, স্পর্শ না করে সে জলে,
বিন্দু বরিষণ হ'লে—পিপাসা মিটায় সবাই।
তেমনি থাক্‌লে শত ভাষা, তাতে ত না মিটে তৃষা ;
মাতৃভাষা পূরায় আশা, এমন সুধা আর ত নাই।
নানা ভাষা হ'তে ধন, করি সবে আহরণ,
মায়েরে করি অর্পণ, এস হে জীবন জুড়াই!
মাতৃভাষার গৌরবে, স্বরগীয় সে সৌরভে,
জন্মভূমির জয় হবে, বাসনা করি সবাই।
মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণ, করি প্রীতি প্রতিদান,
মায়ের জয় নিশান—আনন্দে আজি উড়াই।"

ইহার পর ১৩০৬ সালের 'প্রদীপ' পত্রে সুবিখ্যাত গল্প-লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষা-জননীর আরাধনা করিয়া যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ আধুনিক অনেক পাঠকই হয়ত জানেন না। সেজন্য সেটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম:—

"আমাদের বহু সাধনের ধন—
সাধের বঙ্গভাষা,
আয় মা, আয় মা, মুরতি বিকাশি,
পূরা মা ভক্ত-আশা।
জননি গো, তোর সোণা মুখখানি
দেখিব ভরিয়া প্রাণ,
তোর কণ্ঠের সুধাময়ী বাণী
শ্রবণে করিব পান।
সকলে মিলিয়া জেবলেছি প্রদীপ—
মা তোরি আরতি-তরে ;
ডাকিতেছি আজি সকল ভক্ত
আয় মা করুণা করে'।"

'আমাদের বহু সাধনের ধন—সাধের বঙ্গভাষা'—সম্বন্ধে ইহার পর যে দুইটি সঙ্গীত দুই জন কবি গাহিয়া গিয়াছেন, এইবার সেই অমর

সঙ্গীতদ্বয়ের কথা কিছু বলিতে হইবে। একটি গান দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত, অন্যটি লিখিয়াছিলেন—অতুলপ্রসাদ সেন। ১৩১৫ সালের ২১ এ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-প্রতিষ্ঠা হয়। সেই উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন—

(১)

"আজি গো তোমার চরণে জননি!—আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান—
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি'—পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি',
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।

কোরাস্।—

জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।

(২)

জানো কি জননি, জানো কি, কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত!
—হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কি গো মা তারাই তত!
তবু সে লজ্জা, তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমার জন্য;
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি—যেন সে মহৎ মান।

কোরাস্।—

জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি

(৩)

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা, জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায়, পাইয়া তোমার বচন-সুধা;
মরুভূমে সম যখন তৃষায়, আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

কোরাস্।—

জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি

(৪)

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি ;
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটি ;
চাহিনা ক কিছু, তুমি মা আমার, এই জানি, কিছু নাহি জানি আর ;
—তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ।

কোরাস্।—

জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি"

ঈশ্বর গুপ্ত যখন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হায়! হায়! পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।।"

তখন বোধ করি তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, তাঁহার ঐ দুঃখ-প্রকাশের অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল পরে, তাঁহার দেশবাসী মাতৃভাষার পূজার জন্য মন্দির গড়িয়া তথায় সকলে সমবেত হইয়া দেশপূর্ণ পরিতাপ দূর করিবেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের উপরি-উদ্ধৃত গানটি রচিত হওয়ার কিছুকাল পরে মনে হয়, অতুলপ্রসাদ বঙ্গভাষা-সম্বন্ধে এই প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন—

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাঙ্গালা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!

কি যাদু বাঙ্গলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আন্‌ল দেশে ভক্তিধারা
(মরি হায়, হায় রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তিনাশা।

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;
(আরও কত মধুপ গো!)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধ্‌ল সুখে মধুর বাসা!

বাজিয়ে রবি তোমার গানে, আন্‌ল মালা জগৎ জিনে!
(গরব কোথায় রাখি গো!)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগত করে যাওয়া আসা।

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে 'মা, মা' বলে ;
ঐ ভাষাতেই বল্‌ব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা!"

বাঙ্গালাভাষাকে কবি কেন যে 'মোদের গরব ; মোদের আশা' বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা তাহা বুঝিতে শিখুক, ইহাই আমার শেষ নিবেদন। ভাষা-প্রীতি দেশপ্রীতিরই একটি প্রধান অঙ্গ।

নির্ঘণ্ট

অ　　　　　　ই

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৩	রামমোহন রায়	ডেভিড্ হেয়ার
১০২	২৪	১৮৩৯	১৮৪৯